

দ্বিতীয় সংখ্যা
২০১২

আবশিষ্টগর

বাউল ফকির তত্ত্বতালিশ



সহজ ধারা সজ্জ কর

With best compliments

Chopra Enterprises

AUTHORISED CHANNEL PARTNER

আরশিনগর

দ্বিতীয় বর্ষ

আরশিনগর

দ্বিতীয় প্রকাশ : জানুয়ারী ২০১২

@ বাউল ফকির উৎসব কমিটি

প্রকাশক : বাউল ফকির উৎসব কমিটি

প্রচ্ছদ : অমিত রায়

অঙ্করবিন্যাস : মিতু আর্ট

মুদ্রক : দিলীপ প্রিন্টিং হাউস

১৪বি, ড. শরৎ ব্যানার্জী রোড,

কলকাতা - ৭০০ ০২৯

বিনিময় : ১৫০ টাকা

সম্পাদক : পার্থ মজুমদার

সহ-সম্পাদক : সাত্যকি ব্যানার্জি

এমন মানবজনম আর কি হবে
মন যা করো ত্বরায় কর এই ভবে।।

সূচীপত্র

আমাদের কথা	৭
সময় আর শব্দের রেখায় ম্যাপ-নির্মাণ মৌসুমী ভৌমিক	১১
কেন লালন চাই আবুল আহসান চৌধুরী	২৫
সন্ধ্যাস প্রাপ্তি : খেলকা পরানোর উপলক্ষ আবুল আহসান চৌধুরী	৩৭
লালন আমার মুক্তির সনদ সুদীপ সিংহ	৪৩
শব্দ ও শোনা বিষয়ে কিছু ভাবনা সুকান্ত মজুমদার	৬৫
হাসন রাজা, তাঁর গানের তরী মৃদুল কুমার চক্রবর্তী	৭৫
‘ফকির-ফাকরা-আ(উ)ল-বা(উ)ল’-দের গান ও তার অণু-সঙ্গ ঘিরে দু-চার কথা অরূপ দাস	৯৭
কুড়ি বছর পরে, এগারো মাইল (রুচির জোশি ও সুরজিৎ সেনের কথোপকথন)	১০৫

মানুষ থুইয়া খোদা ভজ
এ মন্ত্রণা কে দিয়াছে

আমাদের কথা

২০০৬ সালে বাউল ফকির উৎসবের প্রথম বছরে বীরভূমের কানাই দাস বাউল হাউড়ে গৌসাইয়ের একটি পদ গেয়েছিলেন, সেই পদটি হলো, রসময় কী ট্রামগাড়ি ধরে বানাইছে/ সুযুমার মধ্য পথে সর্বদাই চলতেছে, এই পদটিতে উনিশ শতকের কলকাতার উত্তর চিৎপুর (চিৎপুরেতে চিত্রেশ্বরী/ চতুর্দলের মধ্যে হেরি/ওই দলে গোকুলের বাড়ি/রাধাশ্যাম আছে) থেকে দক্ষিণে/ কালীঘাট (এই পর্যন্ত সীমাবদ্ধ/ কালীঘাট জগৎ বিখ্যাত/তাহাতে সহস্র পদ্ম প্রকাশ রয়েছে) পর্যন্ত ঘোড়ায় টানা ট্রামের যাত্রাপথটিকে মানব শরীরের সাধনার চিত্রকল্প হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তখন পদটি শুনে মনে হয়েছিল, এই শহর যদি বাউল ফকিরদের গানের শরীরে নিজের জায়গা করে নিতে পারে, তাহলে নিশ্চয় বাউল ফকিররাও এই শহরের শরীরে নিজেদের জায়গা করে নিতে পারবেন। আজ সাত বছর পরে মনে হচ্ছে যে, হ্যাঁ, এই শহরের শরীরে বাউল ফকিররা নিজেদের গান গাওয়ার একটি স্পেস করে নিতে পেরেছেন। এই যে স্পেসটি তৈরি হয়েছে, তার কারণ শুধু আমাদের অকুতোভয় উদ্যোগ নয়, যাঁরা গান গাইতে আসছেন তাঁদের এখানে গান গাইতে আসার অমেয় আগ্রহ আর এই শহরের অগণিত শ্রোতার এই ধরনের গান শোনার অপার ইচ্ছে, এই তিনে মিলে স্পেসটি তৈরি হয়েছে।

স্পেসটা শুধু যে তৈরি হলো তা নয়, গত সাত বছর ধরে সেটি নিজস্ব নিয়মে বাড়তে থাকলো আমাদের তোয়াক্কা না করে। প্রথমে যে স্পেসটি আমরা নিয়ন্ত্রণ করতাম সেটি এখন আমাদের পরিচালনা করে। শুরুতে যেমন ব্যাপারটা ছিল একদল বন্ধুর অসংগঠিত উদ্যোগ এখন আর তা রইল না। এই সাত বছরে পৌছে আমরা দেখলাম, এই স্পেসটির বৃদ্ধিকে যথাযথ মর্যাদা দিতে আমরা যদি সংগঠিত না হই, তাহলে আমরাও আর এই স্পেসটির সহচর্যে থাকতে পারব না। তাই এই বছর থেকে 'বাউল ফকির উৎসব কমিটি'র উত্তরণ

হচ্ছে একটি সরকার স্বীকৃত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায়। এই বছর থেকে উৎসবের যাবতীয় হিসেব নিকেশ অডিট করে সর্বসাধারণের কাছে প্রকাশ করা হবে।

এবার আমাদের উৎসবের পত্রিকা আরশিনগর দ্বিতীয় বছরে পড়লো। এই সংখ্যায় আমরা বাংলাদেশের ঢাকা জেলার পারুলিয়া গ্রামের সাধক দীন দ্বিজদাসের একটি দুস্তাপ্য জীবনী প্রকাশ করতে পেরেছি। বাংলাদেশের সিলেট জেলার বাসিন্দা মৃদুল কুমার চক্রবর্তী বিখ্যাত সাধক ও পদকর্তা হাসনরাজার বিষয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা করেছেন, ২০১১ সালে তিনি প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর হাসনরাজা বিষয়ক একটি লেখা বাংলাদেশের একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, সেটির পুনর্মুদ্রণ করা হলো এবার। কলকাতার বাসিন্দা সুদীপ সিংহ ২০১০ সালে নিজের কাজে বাংলাদেশে গিয়েছিলেন। তিনি দেখা করেছিলেন ফকির আনোয়ার হোসেন শা মন্টুর সঙ্গে, তাঁদের কথাবার্তাও এখানে রাখা হলো। সুকান্ত মজুমদার, শব্দ নক্সাকার, যিনি গত সাত বছর ধরে বাউল ফকির উৎসবের যাবতীয় গান রেকর্ডের দায়িত্বে আছেন, তিনি তাঁর এই সাত বছরের অভিজ্ঞতা এবার আমাদের লিখে জানাবেন।

লেখক, চলচ্চিত্রকার রুচির জোশি জন্মসূত্রে কলকাতার মানুষ। কুড়ি বছর আগে তিনি বাউলদের নিয়ে ইলেভেন মাইলস নামে একটি ডকুমেন্টারি ফিল্ম করেছিলেন, সুরজিৎ সেন এই ফিল্মের নানা বিষয়ের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন। এঁরা দুজন কুড়ি বছর পর এক নিভৃত আলাপচারিতায় সেই ফিল্মটি নিয়ে স্মৃতিচারণা করেছেন। সঙ্গীত গবেষক মৌসুমী ভৌমিক তাঁর সঙ্গীত সংগ্রহের পদ্ধতি নিয়ে একটি মূল্যবান নিবন্ধ লিখেছেন। এই হলো এবারের পত্রিকার বিষয়সার।

২০১০ সালে আমাদের বন্ধু বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলার বাসিন্দা অম্বরীষ দত্তের উদ্যোগে সেখান থেকে ৮/৯ জন শিল্পীর দল এসে আমাদের উৎসবকে আরও বর্ণময় করে তুলেছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন চন্দ্রাবতী রায় বর্মণ। এর ফলে আমাদের উৎসবের মানচিত্রটি আরও প্রসারিত হলো। সেই প্রসারণের হাত ধরে এবার ঢাকার মানিকগঞ্জ থেকে শাহজাহান মুন্সী আসছেন, যেমন অসমের শিলচর থেকে ফরেজুদ্দিন ও ময়না এঁরা এসেছিলেন। এইভাবে যখন উৎসবের মুখটি পাল্টে যাচ্ছে তখন স্বাভাবিক

ভাবেই আমাদের মনে হয়েছে উৎসবের বিষয়টিও বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠুক। আমরা যদি মধ্যযুগের ভারতের ভক্তি আন্দোলনের ইতিহাসের দিকে তাকাই, তাহলে দেখব যে, ভারতের সাধকরা চিরদিনই পথে পথে ভ্রমণ করে নানাবিধ জ্ঞান অর্জন করতেন এবং এই চলার পথেই অর্জিত জ্ঞান নানাজনকে বিতরণ করতেন। মুক্ত পথেই ছিল তাঁদের সাধনা, মুক্ত পথেই ছিল তাঁদের সিদ্ধি। এই মুহূর্তে যে সব সাধকদের কথা মনে পড়ছে তাঁরা হলেন, কবীর, নানক, মীরাবাদী, চৈতন্য, দাদু, তুকারাম। এঁরা মনে করতেন পথ চলা বন্ধ হলেই তাঁদের সাধনা বন্ধ হয়ে পড়বে। এই এগিয়ে চলার দর্শনটিকে মান্যতা দিতে আমরা এবার উৎসবে আমন্ত্রণ জানিয়েছি মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর সংলগ্ন দেওয়াসের খ্যাতনামা ভজন শিল্পী প্রহ্লাদ টিপান্যাকে, যিনি কবীরের ভজন শোনাবেন আমাদের। এতে আমাদের উৎসবের বিষয়মুখ আরও গতিশীল হয়ে উঠবে, কবীর বলেছেন,

বহতা পানি নির্মালা বন্ধা গন্ধীলা হোয়।

সাধক তো চালতা ভালা দাগ লগৈ ন কোর।।

অর্থাৎ বহতা জল বা চলমান জল নির্মল থাকে, বন্ধ জলই হোয়ে ওঠে দুর্গন্ধযুক্ত, মলিন। সাধকের পক্ষেও সত্যিই সবসময় এগিয়ে চলাই ভাল তাহলে কোনও মলিনতাই তাকে স্পর্শ করবে না। কিন্তু আমাদের ভয়, এইভাবে উৎসবকে এগিয়ে নিয়ে চলার মধ্যে যে ঝুঁকি আছে, আমরা কি তার মোকাবিলা করতে পারবো? এর উত্তরে আবার সেই কবীরকেই আঁকড়ে ধরতে হয়, তিনি বলেছেন,

মারণ চলতা জো গিয়ে তাকো লগৈ না দোষ।

বিপদ ভয় জো বৈঠা রইহে এহি মহা আফশোশ।।

পথ চলতে গিয়ে যদি কেউ বিপদে পড়ে তবু তাতে তার কোনও দোষ নেই, কিন্তু বিপদে পড়ার ভয়ে যে চিরকাল ঘরে বসে থাকে তার কথা ভেবে আপশোশ হয়।

আদমের রুহ সেই
কিভাবে গুনলাম তাই
নিষ্ঠা যার হল রে ভাই
মানুষ মুরশিদ করলে সার।

সময় আর শব্দের রেখায় ম্যাপ-নির্মাণ: মৌসুমী ভৌমিক

সূত্রপাত

রাত্রিবেলায় বরিশালের সদরঘাটে জমজমাট ভিড় আর ঝলমলে আলো, মেলা বসেছে যেন। তিনটি বৃহৎ জাহাজ ঢাকা-পথে রাতভোর যাত্রার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, মানুষ আর মালপত্তরে তাদের পেট ফুলে উঠেছে, হাত নেড়ে বিদায় পর্ব চলছে, আলিঙ্গন, একটু আধটু চোখের জলও বা। এত শব্দ চতুর্দিকে, আর সেই শব্দের এমন জড়ামড়া দশা, যে, একটার থেকে আর একটাকে আলাদা করা যায় না; মাইক, মানুষের হাঁকডাক, চা-চানাচুর - সিগারেট, ছেলেছোকরার দল, নানা রকমের মোটর, কোনও এক আমলা-মন্ত্রী-পারিষদের জন্য পথ করে দেয়া, জাহাজের ভাঁ, হস্তদস্ত শেষ মুহূর্তের যাত্রী। তারপর কাঠের পাটাতন সরে গিয়ে একে একে জাহাজগুলি বন্দর ছেড়ে রওনা দেয়, ফিকে হয়ে যায় মানুষের ভিড় আর স্তিমিত আলোতে কীর্তনখোলার জলের আভাস শুনি খানিক। তবু ছোট হলেও শহর তো, তার পথের ধারে দোকান, রাস্তায় রিক্সার হর্ণ, নতুন বেরোনো তিন-চাকার ব্যাটারি-চালিত গাড়ি, মানুষের কণ্ঠস্বর—জলের শব্দ তাতে চাপা পড়ে যায়। পরদিন সকালে ফের দেখি নদীকে; তখন বন্দরের পাশে বাজার বসেছে, দিনের আলোয় মানুষের অন্য ব্যস্ততা, জলে আর পাড়ে তখন অন্য জান।

নদী যেমন দেশের সীমানা বোঝে না, কেবল নাম পাল্টে পাল্টে চলে, কিছুটা তেমনই মানুষের গান আর গল্প, তারও এক নিজস্ব অবাধ স্রোত থাকে। তবে, মানুষ কিন্তু ঠিক নদীর মতন নয়। তিব্বত-চীন-ভারতের দ্বন্দ্ব, মাঝখানে অরুণাচলের অস্তিত্বের সঙ্কট; বাংলাদেশে আর আসামের মধ্যে অবিশ্বাস, অনুপ্রবেশের কুটিল রাজনীতি; এই সবের ভিতর দিয়েই বহনান্নী সাংপো-সিয়াং-দিহাং-ব্রহ্মপুত্র-যমুনা, এক নদী হয়ে বয়ে যায়। মানুষের চলা ভিন্ন, সে 'দুখভয়সংকটে' স্থানান্তরিত হয়, উৎপাতিত হয়, আবার স্বপ্নে সে

নির্বাসন খোঁজে। নদীর বহমান রেখা দিয়ে যে মানচিত্রের ছবি আঁকি আমরা, সে এক সত্য, কোনও অকারণ রোমান্টিকতা বা নস্টালজিয়া নয়। দুই দেশ, তিন দেশ, চার-পাঁচ-ছয় দেশের জটিল রাজনীতি আর সীমান্তের চেকপোস্টের মতনই সত্য। তেমনই সত্য মানুষের যাত্রাপথের রেখা, যা অবাধ নয়, বরং খণ্ডিত, কোথাও লুপ্ত। সেই রেখাও লেখা হয় তার মানচিত্রের বুকে। আবার, এই মানুষ শব্দবহনকারী; তার শরীরে আর স্মৃতিতে অজস্র স্বর আর সুরের দাগ। সে যখন চলে, তার সঙ্গে সঙ্গে তার গান আর গল্পও চলে। সেই শব্দরেখা টেনে টেনে সে দেশ থেকে দেশান্তরে যায়, নতুন উপনিবেশ, নতুন কমিউনিটি রচনা করে, আবার ওই রেখা ধরেই সে তার স্মৃতির শহর-গ্রামে ফেরে।

গত বছর আষ্টেক ধরে আমি আর সুকান্ত এমন এক মানচিত্রের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছি, যার গায়ে প্রতিনিয়ত এই সব নানা কন্টুর লাইনের আঁচড় পড়ে। কখনও আমরা কোনও নির্দিষ্ট রেখা ধরে চলি, following some given roadmap or songline, কখনও আমাদের চলার কারণেই দাগ কাটা হয়ে যায় মানচিত্রের বুকে। আমরা গান আর গল্প শোনা আর শোনানোর কাজ করি, ঘুরে ঘুরে মূলত বাংলার লোকগান রেকর্ড করি আর আমাদের ফিল্ড-রেকর্ডিং নানাভাবে সংরক্ষণ করার, প্রচার করার চেষ্টা চালাই। একই সঙ্গে এ যেন এক ম্যাপ-নির্মাণের কাজও বটে। The Travelling Archive, a project in cartography.

শুরু করেছিলাম আমি। অবিন্যস্ত কিছু বিষয় ছিল ভাবনায়--বিচ্ছেদ, বিরহ, দেশ, দেশান্তরী, ঘর-বাহির---আর তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা কিছু কণ্ঠস্বর; তীক্ষ্ণ, তীব্র। কিছু শোনা মিথু, জায়গার নাম, নদী, মানুষ, গানের ফর্ম; কিছু বই, ফিল্ম, গানের রেকর্ড। আর ছিল একটা চলা-জীবনের বাইরে বেরোবার তাগিদ। এখানেই শুরু। যেন, in the begining there was a sound। কিন্তু হয়তো শুরুতে কোনও শব্দও ছিল না, কিছুই না, কেবল একটা আন্দোলন, a stirring। সুকান্ত তখন ফিল্ম স্কুলে সাউন্ড রেকর্ডিং পড়ে, ও কী করে যেন জুটে গেল আমার সঙ্গে। তারপর আমরা অনেক জায়গায় গেলাম, অনেক মানুষের সঙ্গে পরিচিত হলাম, তাদের গান-গল্পের সঙ্গে, তাদের চলার সঙ্গে, আর আমাদের কাজের একটা বিন্যাস তৈরি হতে শুরু করলো। কাজের একটা নাম উঠে এলো, এই কাজ থেকেই The

Travelling Archive। আর একটা ওয়েবসাইট তৈরি করলাম, যার ঠিকানা www.the-travellingarchive.org।

আমাদের যাত্রাপথে পশ্চিমবঙ্গ, সংলগ্ন আসাম, বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল, বিলেতে অভিবাসী পাড়া-নানা স্থান ফিরে ফিরে আসছে। এই হলো আমাদের ফিল্ড। এ কাজের প্রাতিষ্ঠানিক নাম ethnomusicology। কিন্তু ethnomusicology'র অনেক রীতি-পদ্ধতি আছে, যাকে গবেষণার পরিভাষায় বলে research methodology। সব নাম আমি জানি না। কী কাজ করেছি, কাজের শেষে তা হয়তো বলে দিতে পারি--ফিল্ড রেকর্ডিং, ডকুমেন্টেশন, ডিসেমিনেশন--শোনা, সংগ্রহ, লেখা, বলা, শোনানো, ছবি দেখানো। সুকান্ত বলতে পারে কীভাবে রেকর্ড করেছে, ওর কাছে মূল প্রশ্ন এবং চ্যালেঞ্জ কী কী ছিল, বা থাকে। শোনা থেকে শোনানোর ধাপগুলোর কথা, শব্দের বিবর্তনের কথা বলতে পারে ও। তারপর ডকুমেন্টেশন, যা মূলত আমার কাজ। কীভাবে লিখি একটা শোনার অভিজ্ঞতা। অনেকটাই লিখতে পারি না, লেখা যায় না। শেষে বিভিন্ন মাধ্যমে ডিসেমিনেশন বা প্রকাশ এবং প্রচার, যার একটা পর্যায়ে আসে আমাদের ওয়েবসাইট নির্মাণ। যে গান আর গল্প মানুষের কণ্ঠ আর কর্ণ, মন আর মনন যুগ যুগ ধরে ধারণ করে এসেছে, তার মৌখিক প্রচার এখনও সম্ভব কি না, ওয়েবসাইটের মাধ্যমে মৌখিক সম্প্রচার সম্ভব কি না, সে কথা আমরা ভাবি--একটা oral transmission of orality। আজকের নাগরিক বিচ্ছিন্নতা আর মানুষে মানুষে অদেখার সময়ে দাঁড়িয়ে কাকে অরাল ট্রান্সমিশন বলবো? আজকের মানুষ কি সর্বত্রই কমিউনিটিহারা, না কি তারও কোনও নতুন কমিউনিটি গড়ার প্রয়াস আছে? শুধু virtual community নয়, এই যে আমরা বন্ধুরা মিলে পুরনো মেলায় ঘুরি, নতুন মেলা বসাই, ঘরে আখড়া করি, গান গাই--এভাবেই দেহ থেকে দেহে গান আর গল্প সঞ্চারিত, ধাবিত হয় কি? চলার পথে এসব কথাও মনে আসে।

কিন্তু এ তো গেল কাজ হয়ে যাবার পর তার বিশ্লেষণ। কাজের শুরুতে কী বলা যায়? বেশ কিছুকাল হলো এই কাজ করছি, এখনও methodology'র প্রশ্নটি আমায় ধন্দে ফেলে। কোথায় যাবো বা কেন যাবো, বা কীভাবে, তা আমাদের জানা থাকে না। তখন ভাবি, চলার শেষটা নয়, প্রোসেসটাই বোধহয় আসলে গুরুত্বপূর্ণ। কোথায় এলাম আর কীভাবে, তা কখনও কখনও কাজের

শেষে প্রতিভাত হয় বৈকি, আবার কখনও হয়ও না। কেবল যা এখনও অনুভব করি তা হলো গুরুত্ব সেই আন্দোলন, the stirring।

আর্কাইভ বিষয়ক

এ বছরের মাঝামাঝি সময়, অর্থাৎ ২০১১'র অগাস্ট নাগাদ, লন্ডনের ন্যাশনাল ম্যারিটাইম মিউজিয়াম (NMM) তাদের ফিল্ম আর্কাইভের দুটি তথ্যচিত্রের জন্য আমাদের সাউন্ডট্র্যাক তৈরি করতে বলে। ওরা দ্য ট্র্যাভেলিং আর্কাইভের কাজের কথা জেনেছিল আর বিষয়ের কারণে ওদের মনে হয়েছিল যে এই কাজটি আমাদের করতে বলা যায়। তবে, আমরা ঠিক কী করবো, আলাদা আলাদা দুটো সাউন্ডট্র্যাক, না কি একটা, না আর কিছু, সেই সিদ্ধান্ত ওরা আমাদের ওপরেই ছেড়ে দেয়। সাউন্ডট্র্যাকে কী থাকবে না থাকবে, সে বিষয়েও ওরা কিছু বলে না। তথ্যচিত্র দুটির বিষয় পূর্ববঙ্গের নদী ও জলযান, সময় ১৯৫৮-৫৯। অর্থাৎ, সে সময় 'পূর্ববঙ্গের' অস্তিত্ব লুপ্ত হয়েছে, এবং তখনও পর্যন্ত স্বাধীন বাংলাদেশ স্থাপিত হয়নি; তখন ওই ভূখণ্ডের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান।

ছবি দুটি সে সময় 16 mm ফিল্মে তোলা হয়েছিল। একটি ১৩.৫ মিনিটের, নাম *Rowing and Sailing Boats of Bangladesh*, ওদের আর্কাইভের ক্রমিক সংখ্যা ESF 0217, তৈরি করেছিলেন ব্যাসিল গ্রীনহিল (১৯০২-২০০৩), যিনি এক সময় ওই মিউজিয়ামের অধিকর্তা ছিলেন এবং যাঁকে নদী, সমুদ্র এবং জলযান বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ মনে করা হয়। ওঁর বিখ্যাত বই-এর মধ্যে রয়েছে দুই খণ্ডের *The Merchant Schooners* (1951-'57), *Boats and Boatmen of Pakistan* (1971) এবং *Archaeology of the Boat* (1976)। এই ফিল্মটির চিত্রগ্রহণের সময় গ্রীনহিল পাকিস্তানের ব্রিটিশ কাউন্সিলে কর্মরত ছিলেন। অন্য তথ্যচিত্রটি ২২ মিনিটের, *Indian River Trip*, NMM-এর ক্রমিক সংখ্যা ESF 0479, তৈরি করেছিলেন কর্লেট নামের কেউ, কিন্তু কী তাঁর পরিচয় জানা যায়নি। NMM ছবি দুটি digitize করে আমাদের পাঠিয়ে দেয়। সেটা ছিল সেপ্টেম্বর মাস। স্থির হয় যে আমাদের কাজ আমি লন্ডনে গিয়ে মিউজিয়ামের 'Traders Unpacked' অনুষ্ঠানে উপস্থাপন করবো নভেম্বরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে (ম্যারিটাইম মিউজিয়াম বুটেনের সঙ্গে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব

এশিয়ার বানিজ্যের ওপর একটি নতুন গ্যালারি স্থাপন উপলক্ষে এই অর্ধবর্ষব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে)। অর্থাৎ, আমাদের সামনে মাস দেড়েক সময় ছিল কাজ করবার, কিন্তু ঠিক কী কাজ আমরা করবো তা জানা ছিল না।

এই যে একটা কাজের পথ বা পদ্ধতি নির্দেশ করে না দেয়া, অথচ একটা আস্থা রাখা যে শেষ পর্যন্ত কাজটি কোথাও একটা গিয়ে দাঁড়াবে নিশ্চয়, এবং সেটাই অনিবার্যভাবে এর ফাইনাল ডেস্টিনেশন নাও হতে পারে, আর কোথাও যাবার থাকতেই পারে—ন্যাশনাল ম্যারিটাইম মিউজিয়ামের এই ধরনটি আমাদের ভাল লেগেছিল। এর সঙ্গে আমরা নিজেদের মেলাতে পেরেছিলাম, কারণ আমরাও তো বার বার দেখেছি যে চলাটা শুরু হলে কোথাও একটা গিয়ে ঠিকই ঠেকি; কোথায় যাবো, তা আগে থেকে নাই বা জানলাম। আসলে, এ তো শুধু আক্ষরিক অর্থে চলা নয়, মনও সঙ্গে সঙ্গে চলতে শুরু করে, সময় পারাপার করে, মানচিত্রের ওই সব নানান জটিল রেখা ধরে এগোয়, পিছোয়, থামে, আবার চলে। এ ছাড়াও, এই কাজটির সঙ্গে জড়িয়ে ছিল আর্কাইভ বিষয়ক দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, যা সময় সংক্রান্ত। এক, আজকের এই অনায়াস ফ্রি কপির দিনে আমরা কোনও কিছু আর্কাইভ করবো কেন এবং করি যদি, তাহলে তা কী উপায়ে করবো? দুই, আর্কাইভে রাখা পুরনো নথিপত্র, রেকর্ড, ছবি ইত্যাদি বর্তমান সময়ে কীভাবে ব্যবহার করবো আমরা, যাতে পুরনোর একটা নতুন প্রাসঙ্গিকতা তৈরি হয়, পুরনোতে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়? ম্যারিটাইম মিউজিয়ামে যাবার পরে আমি জেনেছি যে আমাদের মতন ওদেরও এই কথাগুলো ভাবাচ্ছে, বিশেষ করে ওদের আর্কাইভের কর্মী স্টিভ মার্টিনকে, যে কারণে ওরা আর্কাইভ থেকে সংগ্রহ নিয়ে নতুন করে কাজ করার কথা ভাবছে। সেই সূত্রেই এই দুটি ছবি আমাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল।

নদীর শব্দ

অক্টোবর মাসে সুকান্ত আর আমি বাংলাদেশে যাই নদী আর নদীর আশপাশের শব্দ সংগ্রহ করতে। কলকাতা থেকে ফরিদপুরে যাই। ফরিদপুরে কুমার, পদ্মা, তারপর বরিশালে কীর্তনখোলা। কীর্তনখোলায় একটা জাহাজ এসেছিল সুন্দরবন থেকে, তার নাম 'অবসর', সেটি আমাদের বন্ধু মিলনদা (হাসান মনসুর) আর তপুদিদের (তপতী আফ্রোজা মনসুর) নিজস্ব ভ্রমণ কোম্পানি

গাইড ট্যুরস্-এর জাহাজ। ওঁরা সফর করে ওই পথে ফিরছিলেন, আমাদের সঙ্গে তুলে নেন। দিনভর জল বেয়ে বর্ষাশেষের অথৈ মেঘনায় পৌঁছই, এপার ওপার বোঝা যায় না আর। একসময় আলো কমে এলে নোঙর নামে জলের বুকে, জাহাজেই রাত কাটে। পরদিন আবার চলতে চলতে নদী গিয়ে পড়ে শীতলক্ষ্যায়। মিলনদা আমাদের নারায়ণগঞ্জের ঘাটে নামিয়ে দেন, সেখান থেকে গাড়িতে ঢাকা, ঢাকা থেকে কলকাতা, আবারও পদ্মা পেরেই। চক্রাকার এই যাত্রাপথে আরো অনেক নদীই ছিল, সব নাম তো জানা হয়নি।

নামের এমন একটা দ্যোতনা থাকে! বরিশালে যাচ্ছি যখন আমার মা'কে ফোনে একটা মেসেজ পাঠাই; কী যেন নাম ছিল মা তোমাদের গ্রামের? এত বছর ধরে আমি বাংলাদেশে আসছি, সেই ১৯৯৪ থেকে, বরিশালে কখনও যাইনি। আমার বড় মামা বলতেন, একবার তোর সঙ্গে যাবো। আমিও বলতাম, আচ্ছা নিয়ে যাবো। কিন্তু সে আর হয়নি। একবার কেবল বরিশালের ঝালোকাঠির একটা গামছা নিয়ে গিয়েছিলাম মামার জন্য, ফরিদপুরের বাজার থেকে কিনে। আসলে, যেহেতু আমি ঠিক 'দেশ' খুঁজতে যাইনি কখনও বাংলাদেশে, আর যেহেতু আমার একটা নিজস্ব বর্তমান (যাকে এক অর্থে আমি আমার দেশও বলতে পারি) রচিত হয়েছে ওই দেশে, তাই আমার যাওয়া সব সময়ই আজকের সময়ে, to the here and now। এই সময়ের মধ্যে যতটা অন্য সময় থাকে, যতটুকু সামনে এসে দাঁড়ায় সহজে, ততটুকুই আমি দেখছি, সময় খুঁড়ে স্মৃতি জাগানোর চেষ্টা করিনি। কিন্তু বরিশাল যাবার কথায় আমারও কেমন যেন একটা নিজস্ব শব্দের স্মৃতি আবছায়ায় জেগে উঠলো। মা মাসিদের মুখে শোনা নাম-গইলা বলে কোনও গ্রামে মায়ের মামাবাড়ি ছিল, কিন্তু ওঁদের বাবার বাড়ির নামটা মনে পড়ছিল না। মা ওঁদের ঠাকুমার কথা বলতেন, জলপাইগুড়িতে স্কুল থেকে ফিরে বাধ্যতামূলক মনসার পাঁচালি পড়ার কথা; এর মধ্যেও অনেকবার বলেছেন, বইমেলায় দেখিস তো বিজয় গুপ্তের মনসা মঙ্গলটা পাওয়া যায় কি না। ওইটুকুই বরিশালের উত্তরাধিকার ছিল আমার সঙ্গে, অথচ বরিশালে যাবার পর ওইটুকুই কী করে যেন আমাকে একটা sense of belonging দিলো, যা আমার ইতিপূর্বে বাংলাদেশের আর কোথাও গিয়ে হয়নি। ফরিদপুরের শত্ৰুনাথের চায়ের দোকানের সঙ্গে যে সম্পর্ক আমাদের, সে আমার আর সুকান্তর বাস্তব, আমাদের বর্তমান, আমাদের হাতে নির্মিত। সেখানে বসে আমরা ফি-বছর চা খাই, সালামতভাই-সঞ্জয়-পান্নার

সঙ্গে আড্ডা দিই, হাবীবের গান শুনি। অথচ বরিশালে একটা অন্য সময় এসে দাঁড়াতে চাইলো আমার সামনে। হয়তো সে মনসা মঙ্গল পাঠের শ্রাবণ মাস; তাকে আমি জানিও না কিন্তু। এরকমই হয় হয়তো। আমার বাবা ছিলেন আজন্ম পরবাসী একটি মানুষ, এক নিশ্চিহ্ন সাইলেন্স-এ ঘিরে রাখতেন নিজেকে, আমাদের কখনও ওঁর ছেলেবেলার বাড়িটাতে ঢোকান সুযোগ দিতেন না। বাবার বাড়ি বলতে আমি আমাদের ছেলেবেলার শিলং শহরকেই জেনেছি-মেসবাড়ি, বাসা বাড়ি, ভাড়া বাড়ি, ১৯৭৮-'৭৯ এর দাঙ্গার পর বেচে দেয়া আমাদের নিজেদের ইকরার দেয়াল আর টিনের চালের বাড়ি। পাবনা নামটির কোনও আলাদা অর্থ নেই আমার কাছে, অন্তত এখনও পর্যন্ত। কিন্তু কে জানে? বাস কোনওদিন পাবনার ওপর দিয়ে গেলে হয়তো মনে হবে, কী ছিল তোমাদের গ্রামের নাম?

ম্যারিটাইম মিউজিয়ামের ছবি দুটি বার বার দেখি আর বোঝার চেষ্টা করি, কী শুনতে পাচ্ছি এই ছবিতে? আমার চিন্তার শুরুতে এই কথাটিই ছিল-এটাই আমায় নানা দিকে নিয়ে গেল তার পর, এতেই আন্দোলিত হলাম, একেই stirring বলি। আমি জানতাম যে দুটি তথ্যটিই নির্বাক; কর্লেটের *Indian River Trip* তো বটেই, গ্রীনহিলের *Rowing and Sailing Boats of Bangladesh* ও, যদিও ওই ছবিটির সঙ্গে একটি ভাষ্যপাঠ ছিল, যা প্রথম বার কয়েক দেখার সময় আমি শুনতে পাইনি। কোনও কারণে আমার কম্পিউটারে ওটা শোনা যাচ্ছিল না। তাতে ভালই হয়েছে। আমি আমার মতন করে গান আর গল্পের কথা ভেবেছি।

জোয়ার-ভাটার গান ও অন্যান্য

অত পাল তোলা নৌকো, পাক খাওয়া নদী, মন্সুর গতির ওই চলন দেখলে মাথার মধ্যে যাবতীয় rivertime classics খেলে যায়। রনেন রায়চৌধুরী, হেমাঙ্গ বিশ্বাস-“আমি নদীর কূল পাইলাম না, ঢাকা শ'রের রং বাজারে ...”। নদী বলতে আসলে এই কণ্ঠস্বরগুলিকেই বুঝে এসেছি। তাতে সময়ের অনুষ্ণ, অপরিবর্তনীয় ইতিহাসের দাগ। ঋত্বিক ঘটকের ছবির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এই সব কণ্ঠ। অথবা তিতাসের ধীরাজ উদ্দীন ফকির; পর্দা জুড়ে আধশুকনো, নিস্তরঙ্গ নদী আর তার ওপর পাতা ‘আজব লীলে’। ‘আজব লীলে’ লালনের গান, কিন্তু ধীরাজ উদ্দীনের গায়ন শান্ত-সমহিত, sermonical নয়, যেমনটা লালনের

গান অনেক সময় হয়ে থাকে। বরং তাতে এক আশ্চর্য আকৃতি, ছবির পরের দিকে 'ও, তোর আপন দোষে সব হারালি'র মতনই। ফিল্মে বিশেষভাবে প্রয়োগের কারণেই কি এই সব গান নদীর অনুযুগ পায়, তার visual reference-এর জন্য? গান কি তাহলে কন্সট্রাক্ট বা প্রেক্ষিত-নির্ভর? গানের ক্র্যাসিফিকেশন বা নামকরণ আমাদের একটি methodological সমস্যা, গানকে সব সময় টেক্সট দিয়েও বিচার করা যায় না, পদকর্তাকে দিয়েও না, স্থান দিয়েও না। একই গান আমরা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে গাই। নদী থেকে উৎসারিত সব গানই যে একরকমের হবে, তাও নয়। নদীর নানান দেশ হয়, সব দেশে তো এক সুর, এক ছন্দ-লয়ে গান হয় না? আবার একই নদীর নানান ধরনের গান থাকে, জোয়ারের, ভাটার, যেমন সারীগান, বাইচ গান। তাছাড়া, নদীর দেশে যে মানুষের বাস, তার জীবনের উৎসবে, পার্বণেও তো কত গান হয়।

আমরা ফরিদপুরে বার বার যাঁর কাছে যাই, তিনি সালামত খান। অমন একটা 'লোকাল' মানুষ আমি কমই দেখেছি—নিজের জায়গাটাকে তার অন্তঃস্থল পর্যন্ত চেনেন। নিজের অঞ্চলের গান, সুর, সাধক, কবি, মেলা, পার্বন থেকে শুরু করে নদী, চর, মাছের খবর। ফরিদপুরের বাইরে বড় একটা কোথাও যান না সালামতভাই। ওই সেই শত্ৰুনাথের চায়ের দোকানে আর সাদিভাইয়ের দোকানে বসে প্রতিবার কথা হয়। এবার যোগ হয়েছিল পদ্মার চর, ঘাটের কচুরির দোকান। নদীর কথায় গানের কথা আসে, একই সঙ্গে ইলিশ-পাঙাসের কথা। 'জালের মধ্যে ইলিশ তিনটা লাফ দিয়া মাইর্যা যায়।' আর পাঙাস তাড়িয়ে তাড়িয়ে এনে একটা বেড়ার মধ্যে আটকে ফেলা হয়। সেই পাঙাসের ঝাঁকের ভিতরে কোনও মানুষ পড়ে যায় যদি, তবে সে কাঁটার আঘাতেই মরে যাবে। এত বড় সেই মাছ, আগে আগে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে নদী থেকে শহরে আনা হতো, ঘোড়ার পিঠের দুই দিকে বুলে থাকতো মাছ, এক দিকে মাথা, অন্য দিকে ল্যাজ। এসব গল্প সালামতভাইয়ের সময়ের বা অন্য কোনও সময়ের, ছবিটা সালামতভাই এই সময়ে বসে আঁকেন। শব্দ থেকে ছবি তৈরি হয়, চোখের সামনে দেখি ঘোড়ার পিঠে চেপে মাছ নদী থেকে শহরে চলেছে; যেমন আমরা ছবির শব্দ শুনি। সালামতভাই বলেন, 'পানিতে যখন স্রোত, নৌকা যখন স্রোতের সঙ্গে চলে তখন মাঝি বৈঠা রাইখ্যা একখান বিচ্ছেদ ধরে।' আর যখন স্রোতের বিরুদ্ধে যেতে হয়, নৌকা বাইতে শ্রম লাগে, তখন

সবাই মিলে সারীগান করে, তাতে দম ফেলে ফেলে, তালে তালে জল ঠেলে এগোনো যায়। 'এই তো বাইচ দিল ভাঙ্গায়, তখন আট-দাঁড়ী বারো-দাঁড়ী নৌকা আনছিল অনেক। এখন এইসব গান ওই খালি বাইচের সময়ই হয়। এইবার তারেক মাসুদের নামে বাইচ দিছিল।'

ব্যাসিল গ্রীনহিলের ছবিতে চমৎকার একটা নৌকা তৈরির দৃশ্য আছে। নৌকা তৈরিকে গ্রীনহিল ভাস্কর্যসম বলে বর্ণনা করেছেন তাঁর লেখায়। আমার দেখতে গিয়ে মনে হয়েছে যে অনেকে মিলে এমন করে নৌকা বানাচ্ছে, তাতে একটা যেন জল ভেঙে ভেঙে এগোনার ছন্দ শুনতে পাওয়া যায়, তলায় তলায় যেন বাইচ চলছে। 'হেইয়ো হো, হেইয়ো হো'। ময়েজ বলেছিলেন বাইচের কথা। আহমদ ময়েজ, লন্ডন প্রবাসী এক সিলেটি কবি, লেখক; সিলেটের সৈয়দপুরের পীরবাড়ির ছেলে। লন্ডনে ২০০৭-এর ফেব্রুয়ারি মাসে একদিন ব্রিক লেনের পাশে কোয়েকার স্ট্রীটে, সুরমা নিউজ পত্রিকা অফিসে বসে ময়েজ অনেক কথা বলেছিলেন তাঁর দাদা, পীর মজির উদ্দীন সম্পর্কে। সেই প্রসঙ্গে ওঁদের অঞ্চলের আরও সব সাধক কবিদের কথা উঠেছিল, যেমন শাহ নূর। 'অমন মাঝি রে, পাক পানি চিনিয়া নাও বাইয়ো।' ময়েজ পপকর্নের খালি কৌটোকে ডুবকি করে বাজিয়ে বাজিয়ে গেয়েছিলেন, চমৎকার গাইতে পারেন তিনি। 'একেই বলে নৌকা বাইচের সুর,' ময়েজ বলেছিলেন। 'শাহ নূরের সময়টা ছিল, এই ধরুন, আজ থেকে আনুমানিক আড়াইশ' বছর আগে,' এও ময়েজই বলেছিলেন আমাদের।

সময়ের কথা

সময় আর শব্দের অনেক সুতো জড়িয়ে যেতে থাকে চিন্তার ভিতরে। গ্রীনহিলের *Boats and Boatmen of Pakistan* ছাপা হয়েছিল ১৯৭১-এ, সেটা ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বছর। তিনি পূর্ব পাকিস্তানে ছিলেন ১৯৫০-এর দশকে। অনেক বছর পরে এক জায়গায় লিখেছেন, ঢাকার ওপর যখন তাঁদের প্লেন নামছে, তখন তিনি দেখেছিলেন নদীভরা নৌকা আর মনে হয়েছিল, এ দৃশ্য আজ বিশ্বে বিরল। '... my first real sight of further East [of Calcutta] ... as we came in low over the monsoon-inundated countryside was the boats, scores and scores of them, under squaresails and spritsails, being rowed, sculled and paddled, or some of them towed from

the mast head by two or three men on a river bank. I had had no forewarning that we were approaching what was then probably the richest boat culture in the world at the height of its richness.' (Introduction', in McGrail, Sean, *Boats of South Asia*. New York and London: Routledge Curzon, 2003)

গ্রীনহিল বাংলার বিভিন্ন নৌকোর মধ্যে দেখেছিলেন ইওরোপের বহু প্রাচীন নৌকোর গঠন, যার হদিস মেলে মধ্যযুগীয় আইকোনোগ্রাফিতে—আঁকা ছবিতে, কাঠের খোদাইয়ে, পাথরের এচিং-এ। ১৯৫০-এর দশকে, যে সময় বাংলার নৌকো নিয়ে বিশেষভাবে চর্চা করছেন তিনি, সেই সময় ইওরোপ থেকে সেই নৌকো অবলুপ্ত, কারণ সেখানে অনেক আগে থেকেই জলযানের যান্ত্রিকীকরণ শুরু হয়ে গেছে। বস্তুত, বাংলার নৌকোতেও তখন মোটর লাগতে শুরু করেছে। *Boats and Boatmen of Pakistan* (Newton Abbot: David & Charles, 1971)-এ তিনি লিখছেন, 'Motor launch services pay. They are beginning to change the pattern, of life in rural Bengal. Like buses, people go quickly and cheaply.'

কিন্তু তারপরেও বিভিন্ন সময়ের অস্তিত্ব নদীর ভিতরে, সময়ের সহাবস্থান ও সংঘাত। যেমন নৌকো-জাহাজে, তেমনি নদীর শব্দজগতে। রাতের নদী সম্পর্কে গ্রীনহিল লিখেছিলেন, 'And it is a quiet world of still evening on lonely islands in great rivers when the only sound is the sighing of the dying breeze among the swamp grasses . . . this world has songs and poetry of its own: The river has no bank, no shore. . .' (Greenhill, 1971)। গ্রীনহিল স্পষ্টতই আব্বাস উদ্দীন শুনেছিলেন, হয়তো গ্রামোফোন রেকর্ডে ছাপা ভাটিয়ালি।

আজও নদীতে আর মানুষের জীবনে বিভিন্ন সময়ের অস্তিত্ব, সহাবস্থান আর সংঘাত। তার সুর-শব্দের ভিতরেও সময়ের অনেক স্তর। আমি ছবি দেখে একভাবে ভেবেছি এইসব কথা, সুকান্ত ভাবছিল ওর মতন করে। ও শব্দ সংগ্রহ করে, কীর্তনখোলার পাড়ের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ও কত কী যে শুনছিল কাছের দূরের শব্দ—মাইক বাজিয়ে ওষুধ বিক্রি, জাহাজের ভোঁ—সব

শব্দের কথা আমি জানিও না। 'অবসর' জাহাজের এক কোণে বসে থাকছিল রেকর্ডার নিয়ে, হেডফোন পরে—জলের শব্দ মোটরের শব্দ, মানুষের কথা, মোবাইলে গান বাজিয়ে মাঝিদের রাতের নদীতে মাছ ধরা, দূরে কেউ ডেকে চলে গেল—এইসব তুলে রাখছিল ওর যন্ত্রে। ও কীভাবে ছবিগুলি দেখেছে, পরে ওর রেকর্ড করা শব্দ শুনে আমি খানিকটা জানতে পেরেছি। ওর রাতের নদী, নদীর চর, গ্রীনহিলের মতন ছিল না; তাতে ভেজা ঘাসবনে হাওয়ার কোনও দীর্ঘশ্বাস পড়েনি, তেমন নিশ্চিন্ততার দিন এখন চলে গেছে। এমন যে হতে পারে তার আভাস ছিল গ্রীনহিলের লেখায় এবং কর্নেল্টের *Indian River Trip* ছবিটিতে। তাতে ভবিষ্যতের সংকেত ছিল কিছু। সুকান্ত যেন সেই শব্দের সংকেত শুনে পাচ্ছিল ওই সাইলেন্ট ছবির ভিতরে।

আমি ভাবছিলাম অন্য কথা। ভাবছিলাম, কেমন এই ছবির সময়ের মধ্যে আরও অনেক সময়ের, শুধু ভবিষ্যতের নয়, সুদূর অতীতেরও চিহ্ন লুকানো আছে। এই যে বরিশালে গেলাম আর তখন বিজয় গুপ্ত'র *মনসা মঙ্গল* মনে এলো, তার আগেও কিন্তু বেহুলার কথা ভেবেছি; মনসার কথা, চাঁদ সদাগরের কথা। গ্রীনহিল আর কর্নেল্টের ছবি দুটি দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল, যে নদীতে এক-আধজন মুখঢাকা মহিলা যাত্রী আর ঘাটে কাজ করতে আসা কয়েকটি বউ-ঝি ছাড়া আর সবাই পুরুষ, সেই নদীর জীবনের সঙ্গে নারীর জীবন কীভাবে জড়িয়ে থাকে? কেমন শুনতে লাগে তাদের কণ্ঠস্বর? নদীতে ভাসতে ভাসতে সেই সুরস্বর শুনতে পাই কি? বাংলার এইসব সত্যি আর গল্পের নদীতে একদিন বেহুলা ভেলা ভাসিয়েছিল, নদী-ঘেরা মানুষের জীবন থেকেই তার কল্পনা উঠে এসেছিল। সেখানে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিরন্তর লড়াই আর একান্ত সহবাস। তারই প্রতীক বুঝি মনসা, চাঁদ, বেহুলা, সনকা। আজও শ্রাবণ মাস জুড়ে বাংলার গ্রামে গ্রামে মনসার গান গাওয়া হয়, যে বাংলা খণ্ডিত, বিভক্ত, যার গায়ে হাজারো কাঁটাতারের দাগ আর ইতিহাসের রেখা। বার বার নাম পাল্টিয়েছে দেশ, তবু এই গান আর গল্প নদীর মতনই বয়ে চলেছে। এইখানে শব্দরেখা অপ্রতিরোধ্য, এখানে গল্পের স্রোত অবাধ।

পোস্ট স্ক্রিপ্ট

সুকান্ত নিজের মতন করে ম্যারিটাইম মিউজিয়ামের দুটি ছবি এডিট করে, ওর সংগ্রহের পুরনো, নতুন শব্দ আর আমাদের ট্র্যাভেলিং আর্কাইভের গান দিয়ে

একটা গল্প সাজিয়েছে। ফিল্মের নাম *Life of Rivers* বা নদীর জীবন। তাতে আমাদের শোনা, দেখা আর ভাবনা এসে জড়ো হয়েছে। এমনটা যে হবে আমরা জানতাম না। হলো। তবে এটা আমাদের চলার একটা পর্ব মাত্র, এখান থেকে আরও কোথাও যাবার আছে নিশ্চয়; কোথায়, তা এখনও জানি না।

আমি বিজয় গুপ্ত'র একটা *মনসা মঙ্গল* কিনেছি, অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত। মা'কে এনে সেই বই দিলাম, সেদিন আমার মায়ের চেয়ে দশ বছরের বড় মাসি, তিনিও ছিলেন বাড়িতে। মা বই-এর পাতা ওল্টান আর বলেন, না না, এটা নয়। আমাদের মনসা মঙ্গল এইরকম ছিল না। বলে সুর করে বলেন, বন্দিলাম বন্দিলাম মা গো যন্ত্রে দিয়া যা। আমার মাসিও একটু সুর ধরেন সঙ্গে। সুকান্ত মা'র কাছ থেকে বইটা নিয়ে দেখতে থাকে। বলে, এই তো সেই কথা লেখা আছে। মা বলেন, না না, এইরকম ছিল না। অনেক দীর্ঘ বন্দনা ছিল। তাছাড়া পয়ার ছিল। হাতের ইশারা করে বলেন, ভাঙা একটা লাইন, এদিকে কয়েকটা শব্দ, ওদিকে কয়েকটা শব্দ, তার তলায় মাঝখানে একটা ছোটো লাইন, আবার ভাঙা লাইন:

দিলাম দিলাম পুত্র বর নাম থুইও লক্ষ্মীন্দর
জন্মমাত্র লইবো হরিয়া...

মা গেয়ে শোনান। সুকান্ত বলে, সেও তো আছে। এই তো! বলে পড়তে থাকে; দিলাম দিলাম পুত্র বর / নাম থুইও লক্ষ্মীন্দর / হইলে মাত্র আনিব হরিয়া। মা বলেন, হ্যাঁ, ঠিকই, এইরকমই, কিন্তু ঠিক এটা ছিল না। আমরা রোজ স্কুল থেকে এসে পড়তাম, না রে মেজদি?

আমি এই কথাটা নিয়ে ভেবেছি। কেন মা একই লেখা, একই বিজয় গুপ্তের বইকে চিনতে পারছেন না? তখন মনে হয়েছে, মা বোধহয় কিছু একটা খুঁজছেন যা এই টেক্সট ঠিক দিচ্ছে না। হয়তো সেটা সেই পাঠের সুর, সেই উচ্চারণ, যার থেকে আমার মা নিজেই আজ বিচ্ছিন্ন। ফলে নিজের পাঠকেই আর যেন বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে, নাহ, এমন তো ঠিক ছিল না। কিন্তু কেমন যে ছিল, তাও বলতে পারছেন না। তাছাড়া, এর সঙ্গে হয়তো একটা দৃশ্যগত বিষয়ও জড়িয়ে আছে। অচিন্ত্য বিশ্বাসের বইটি আর পাঁচটা বই-এর মতনই; মাপে, অক্ষরবিন্যাসে তার কোনও বৈশিষ্ট্য নেই। কিন্তু মায়ের ঠাকুমার পাঁচালিটি নিশ্চয় ছিল বহু ব্যবহারে জীর্ণ, শ্রাবণে শ্রাবণে তার পাতার

ভিতর থেকে এমন এক সুর-শব্দ উৎসারিত হতো, যাতে ভয় আর বিশ্বাস জাগতো মনে। হয়তো সেই জন্যই আমার মা, না তো ধ্বনিগতভাবে, না দৃশ্যগতভাবে এই গবেষণা গ্রন্থটির সঙ্গে কানেক্ট করতে পারছিলেন। বলছিলেন, আমাকে একবার ওই আগের মতন বই একটা এনে দিলে আমার সব মনে পড়ে যাবে।

বরিশালে একজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে এবার, সে বলেছে একটা নাকি পুরনো বই এনে দেবে। আর যদি বরিশালে গিয়ে শ্রাবণ মাসে মনসার পাঠ রেকর্ড করতে পারি, তখন হয়তো সেই সুর আর শব্দের রেখা ধরে আমার মা আর মাসি ওঁদের ঠাকুমার শব্দের দেশে পৌঁছতে পারবেন। ঠাকুমা সেই অটল বিশ্বাসের সময়ে। এই ঠাকুমা সারাদিন হাজারো দেবদেবীর পূজো করতেন। সামান্য বয়সে বিধবা হয়েছিলেন, কারো হাতে খেতেন না। আর বাড়ির ছেলেদের নাকি একটু বেশি ভালবাসতেন। বড়ি দিতেন, আর সেই বড়ি রাখতেন নিজের জিম্মায়। বাড়ির সবার রান্নার জন্য বড়ি চাইতে গেলে ছেলেদের জন্য চারটে করে হিসেব করে দিতেন, আর মেয়েদের জন্য দু'টো। আমার মায়েরা প্রতিবাদ করতেন—আমাদের কম কেন? ঠাকুমা বলতেন, অরা পুরুষ না? অরা খাডেপেড়ে না?

সেদিন আমরা মা'দের কথা রেকর্ড করেছিলাম। সেই গল্প বলার মধ্যেও সুর, শব্দ আর সময়ের কত রকম বুনন ছিল; সব কথা তো লিখে বোঝানো যায় না।

মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি
মানুষ ছাড়া ক্ষ্যাপা রে তুই মূল হারাবি।।

এই মানুষে মানুষ গাঁথা
গাছে যেমন আলেকলতা
জেনে শুনে মুড়াও মাথা
ও মন যাতে তরবি।।

কেন লালন চাই

আবুল আহসান চৌধুরী

অনেককাল আগে ব্রাহ্মসমাজের তরুণ-তুর্কিদের মুখপাত্র হয়ে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ 'কেন রবীন্দ্রনাথকে চাই' নামে একটি চটি পুস্তিকা লিখেছিলেন। ১৯২১-এ প্রকাশিত এই লেখায় ব্রাহ্মসমাজের রক্ষণশীল বৃদ্ধদের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করা হয়েছিল। অনুদার পরিবেশ ও আদর্শচ্যুতি রোধে তাঁহার কণ্ঠ হয়ে উঠেছিল জোরালো। প্রগতির উদার হাওয়া যাতে 'সমাজের' দেহে-মনে লাগে এই ছিল তাঁদের প্রত্যাশা। আর সেই কারণে রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা অপরিহার্য ও জরুরি মনে করেছিলেন।

সেদিনের ছোটো পরিসরের 'ব্রাহ্মসমাজ' নয়, আজ 'বাঙালিসমাজে' অবক্ষয়, অবনতি, স্থলন, বিকার, অনাচারের বিষবৃক্ষ নষ্ট মানুষের যত্নে-প্রযত্নে আলো-হাওয়া-জল পেয়ে সতেজ ও বৃহৎ হয়ে উঠেছে। এমন পরিবেশে এমন একজন মানুষকে বড়ো প্রয়োজন যাঁর আদর্শ চেতনা ও প্রেরণায় সমাজদেহের ক্ষত সারিয়ে তাকে সুস্থ ও সচল করে তুলতে পারা যায়। এই প্রেক্ষাপটে লালন কেন প্রাসঙ্গিক সেই বিবেচনার ভূমিকা হিসেবেই এই ক্ষুদ্র নিবন্ধ।

‘মনের মানুষ খেলছে দ্বিদলে

যেমন সৌদামিনী মেঘের কোলে।।’

অথচ সেই ‘মনের মানুষ চিনলাম নারে। / পেতাম যদি মনের মানুষ সাধিতাম
তার চরণ ধরে।’ লালনের এই খেদ জনমন্ডর গেল না! অধরা মনের মানুষের
সন্ধানে লালন পথ হেঁটে চলেছেন, ‘গভীর নির্জন পথে’, কাল থেকে
কালান্তরে। তাঁর ছায়া-হেঁয়া বাঁচিয়ে শাস্ত্রবাহকের দল সেই পথ ধরে তীর্থে
যায় -- দেবালয়ের দুয়ারে পৌঁছোয়। লালন দেখেন ভবের খেলা আর সাঁইয়ের

আজব লীলা। তাঁর দুই চোখে এসে লাগে অন্য আলোর ছটা। চেতনায় বিভক্ত হয়ে যান লালন -- একদিকে মনের মানুষের সন্ধানে শুরু হয় নিরন্তর যাত্রা, পাশাপাশি পথের কাঁটা সামাজিক বাধাকে পেরিয়ে যাওয়ার জবর লড়াই। এইভাবে লালন হয়ে ওঠেন একই সঙ্গে মরমি ও দ্রোহী—সমাজশিক্ষক ও সংস্কারক—আধ্যাত্মসাধনার পরম গুরু ও মানবমুক্তির দিশারি এবং লোকায়ত বাঙালির বিবেক।

লালন জন্মেছিলেন ২৩৭ বছর আগে সংস্কারশাসিত বাংলার এক অখ্যাত গ্রামে। ১১৩ বছরের দীর্ঘ আয়ু পেয়েছিলেন তিনি। তাঁর এই দীর্ঘজীবন বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পূর্ণ। এই অভিজ্ঞতার বড়ো অংশই বেদনা আর বিস্ময়ের। জাতপাত, সম্প্রদায়-বিদ্বেষ, শাস্ত্র-ধর্মের প্রতাপ, শ্রেণি-পীড়ন, সামাজিক অনাচার, নারীর নিগ্রহ, মনুষ্যত্বের অবমাননা, মানবতার লাঞ্ছনা, শক্তির অর্চনা, যুক্তিহীন আচরণ, সামন্তশোষণ—মানুষের জীবনকে বিষাদ-নৈরাশ্যে ডুবিয়ে রেখেছিল। লালনের কাল থেকে দুই শতকেরও বেশি সময় পরেও এই পরিস্থিতি পাল্টায়নি। হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর রূপ বদলেছে, কিন্তু সমাজদেহ থেকে এর ছাপ পুরোপুরি মুছে যায়নি।

লালনের সাধকজীবন দুইভাগে ভাগ হয়ে গেছে—একদিকে মরমিসাধনার নম্রধারা, অন্যদিকে রয়েছে দ্রোহের আগুন জ্বলে সমাজের অনাচার-আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলার প্রয়াস। অথচ যে সাধনার ভুবনে তিনি প্রবেশ করেছিলেন, সেখানে তো বাইরের জগতের ঘটনায় আলোড়িত হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু বাউলকে প্রতিবাদী ও দ্রোহী হতে হয় কেন? আসলে বাউলের জন্মই তো প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে, উচ্চবর্ণের মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই করে—ক্ষমতাশালী বিভূবানদের বিপক্ষে এ ছিল নীরব গরিব-গণবিদ্রোহ। মরমিসাধনায় যাঁরা সামিল হয়েছিলেন সমাজের অবজ্ঞা ও নিগ্রহ থেকে আত্মরক্ষার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে তাঁরা অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যানের গরজ বোধ করেছিলেন অন্তরে। বাউলের তাই কোনো শাস্ত্র নেই—গুরুর আদেশ-নিষেধই গান হয়ে তাঁদের দিশা দেয়—পথ দেখায়। লালনের জীবন ও সাধনাও চলেছে এই ধারায়।

বারবার আঘাত এসেছে বাউল সম্প্রদায় ও লালনের উপর। বাউল-তাচ্ছিল্যের পরিচয় মিলবে মধ্যযুগের দু-একটি পুঁথি বা পদে। ওহাবি-ফারায়জি আন্দোলনের ফলে বাউলদলন জোরালো হয়েছে। ‘জাতির

পশ্চাতে’ যে ব্রাহ্মধর্ম ও গৌরবাদীদের মতো ‘লালন সম্প্রদায়েরা’ও ‘খোঁচা মারিতেছে’—এমন অভিযোগ করেছেন কাঙাল হরিনাথ। মৌলবি আবদুল ওয়ালির সমালোচনা থেকেও রক্ষা পাননি লালন ও বাউলেরা। এসব উনিশ শতকের কথা। এরই ধারাবাহিকতায় কয়েক দশক পর জারি হয় ‘বাউল ধ্বংস ফৎওয়া’। এই ‘ফৎওয়া’য় বলা হয় : ‘...ন্যাডার ফকিরগণ লালন সাহার সম্বন্ধে কোনই পরিচয় না জানিয়ে হুজুগে মাতিয়া হিন্দু বৈষ্ণবগণের দেখাদেখি লালন শার পদে গা ঢালিয়া দিয়া মোছলমান সমাজের কলঙ্কস্বরূপ হইয়াছে ইহা অতিশয় পরিতাপের বিষয়।’ মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁও সাই দেন বাউল বিরোধিতায়। বাউল-ফকিরদের সম্পর্কে বিরূপ ধারণা থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌছোন যে, বাউলমতের প্রসার মুসলিম সমাজের চারিত্রিক ও নৈতিক অধঃপতনের একটি প্রধান কারণ। সরাসরি কিংবা খানিকটা আড়াল মেনে এই বাউল-নিগ্রহ বা লালন-নিন্দার প্রচার থেমে থাকেনি। আধুনিককালেও, এমনকী হালেও যখন কথিত আধুনিক শিক্ষিত বাঙালি মতে-মন্তব্যে লালনকে খাটো বা খারিজ করতে চান তখন আমরা বিচলিত ও অসহায় হয়ে উঠি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একসময়ের উপাচার্য সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন রায় দিয়েছিলেন লালন সহ অন্যান্য লোককবি যেসব গান রচনা করেছেন তাতে নাকি ‘যথেষ্ট রসবোধের পরিচয় নাই’ এবং তা ‘গ্রাম্যতাদোষে দুষ্ট বলিয়া ভদ্রসমাজে স্থান করিয়া লইতে পারে নাই।’ আবার কিছুকাল আগে আর এক ‘পণ্ডিত’ সুধীর চক্রবর্তীর বইয়ে পাওয়া গেল, লালন না কী ছিলেন ‘জন্ম পরিচয়হীন জারজ’! সুধীরের বইয়ে ছাপা এই মন্তব্য উচ্চবর্ণের বাউলঘৃণার এক নিকৃষ্ট উদাহরণ। সুধীজন ও বাউলেরা এই লালন-বিদ্বেষকে কীভাবে নেবেন জানি না! অগণন ভক্ত এবং রবীন্দ্রনাথ থেকে অন্নদাশঙ্কর রায়ের লালন-অনুরাগ কী তবে এই ‘জারজ’ মন্তব্যের পাঁকে ডুবে যাবে? লালনের কথা দিয়েই এই প্রসঙ্গে বলতে হয় : ‘নালিশ জানাবো কার কাছে?’ কী ভেবে এঁদের সম্পর্কে আগেই লালন লিখে গিয়েছিলেন : ‘পণ্ডিত কানা অহংকারে’। আশা আর আনন্দের কথা এই শহুরে শিক্ষিত অনুদার প্রতিক্রিয়াশীলদের অপ-মন্তব্যের জবাব দিয়েছেন শওকত ওসমান লালনকে নিয়ে গদ্য লিখে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় উপন্যাস লিখে, শামসুর রহমান কবিতা লিখে, আর তনভীর মোকাম্মেল ও গৌতম ঘোষ ছবি বানিয়ে—যেখানে লালন ফুটে উঠেছেন অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক মানবতাবাদী দার্শনিক, সাধক ও কবি হিসেবে।

লালন সম্পর্কে যে অবজ্ঞা-নিন্দা-বিদ্বেষ তা তো বিকারগ্রস্ত সমাজমনের প্রতিফলিত ফসল। কেন লালনকে এর শিকার হতে হয়? এক কথায় জবাব দিলে বলতে হয়, লালন সারাজীবন মুক্তচিন্তায় বিশ্বাসী ছিলেন, মানবতাবাদী দর্শনকে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, ঘুণে ধরা সমাজটাকে বদলাতে চেয়েছিলেন, জাতধর্মকে দূরে সরিয়ে মানুষকে মানবিকতাবোধে বিকশিত করার ব্রত নিয়েছিলেন। সামান্য মরমি ফকিরদের এসব উল্টোপাচার কর্মকাণ্ড বরদাশ্ত করবেন কেন সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষ! কেননা ধর্মের অছিলায় — শাস্ত্রের নামে — অর্থের জোরে — শক্তির দস্তে সমাজঘরের সব জানালা তাঁরা বন্ধ করে চিরস্থায়ী এক আঁধারের রাজ্য তৈরি করতে চেয়েছিলেন। লালন তাতে বাদ সেধেছিলেন বলেই না তিনি আলো সহিতে না পারা পেচক-প্রজাতির মানুষের দূশমন হয়েছিলেন। পাষাণ, ব্রাত্য, ন্যাড়া, বেশরা, জারজ এইসব গালমন্দ তাঁকে শুনতে-সহিতে হয়। তবে আরোপিত কলঙ্ক আর নিন্দা সমকালেই — উত্তরকালে তো বটেই — বিবেকবান মানুষের সুবিবেচনার কল্যাণে লালনের গৌরবচিহ্ন হয়ে উঠেছিল।

লালনের তো শুধুই লেখার কথা ‘তিরপিনির তিরোধারে মীনরূপে সাঁই খেলা করে’, ‘আয় হারালি আমাবতী না মেনে’, ‘গেঁড়ে গাঙের ক্ষ্যাপা হাপুর-হুপুর ডুব পাড়িলে’ ‘ধর চোর হাওয়ার ফাঁদ পেতে’, ‘আজব আয়নামহল মণি-গভীরে’ কিংবা ‘ধর রে অধরচাঁদের অধরে অধর দিয়ে’ — এইসব সাধনার গান, জটিল বাউলতত্ত্বের গান। কিন্তু অভিজ্ঞতা আর পর্যবেক্ষণে তিনি জেনেছিলেন, সমাজের আঁধার না ঘুচলে সাধনার আলো ফুটবে না। সাধন-ঘরানার বাইরে গিয়ে তাই তাঁকে লিখতে হল সমাজকে জাগানোর গান — মানুষকে আলোকিত করার গান। সমাজের নানা অনাচার, কুরীতি ও অসঙ্গতি ধরা পড়েছে লালনের চোখে। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি জেনেছিলেন : ‘কলিতে অমানুষের জোর/ভালো মানুষ বানায় তারা চোর’। নীতি - নৈতিকতা হয়ে ওঠে কথার কথা : ‘তলে তলে তলপোঁজা খায়/লোকের কাছে সতী কবলায় / এমন সৎ অনেক পাওয়া যায় / সদর যে হয় সেই পাতকী।’

মধ্যযুগের সহজিয়া কবি রূপকের ছলে উচ্চারণ করেছিলেন : ‘সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।’ মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণার জন্যে লালন সেই রূপকের আড়াল তুলে দিয়ে সরাসরি বললেন : ‘অনন্তরূপ সৃষ্টি করলেন

সাঁই / শূনি মানবের উত্তম কিছুই নাই / দেব-দেবতাগণ করে আরাধন / জন্ম নিতে মানবে।’ পুনর্জন্মে বিশ্বাস ছিল না লালনের — তাই একবারের জন্যে নশ্বর এই পৃথিবীতে আসার সুযোগকে সুকৃতিতে সার্থক করে তোলার পক্ষে তাঁর ছিল একান্ত আকুতি : ‘কত ভাগ্যের ফলে না জানি / মন রে পেয়েছো এই মানবতরণী / বেয়ে যাও ত্বরায় সুধারায় / যেন ভারা না ডোবে।’ ‘জগৎ সত্য ব্রহ্ম মিথ্যা’ — এই চেতনা যে অনেকখানিই লালনকে উদ্বুদ্ধ করেছিল তাঁর গানে সেই পরিচয় একেবারে ঢাকা থাকেনি। ইহজাগতিকতার হাতছানিতে লালন সাড়া না দিয়ে পারেননি : ‘এমন মানব-জনম আর কি হবে / মন যা করো ত্বরায় করো এই ভবে’। পরলোকে স্বর্ণপ্রাপ্তির চাইতে দুনিয়ার ‘নগদ পাওনা’র প্রতিই তাঁর বেশি ঝোঁক ছিল — তাঁর গানে সেই কথাটিই তিনি জানিয়ে দিয়েছেন। মানুষই ছিল লালনের মনোভূমির কেন্দ্রে। তাই মানবজীবন, মানবগুরু, মানবভজনার কথা বারবার উঠে এসেছে তাঁর গানে। ‘মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবে’, ‘ভবে মানবগুরু নিষ্ঠা যার / সর্বসাধন সিদ্ধ হয় তার’, ‘আছে যার মনের মানুষ মনে তোলা সে কি জপে মালা’, ‘সেই মানুষে আছে রে মন যারে বলে মানুষ-রতন’, ‘মানুষত্ব যার সত্য হয় মনে / সে কি অন্য তত্ত্ব মানে’ — লালনের এইসব পদ সাধনার প্রয়োজনে বাঁধা হলেও তা মূলত মানববন্দনারই গান। ‘মানুষ অবিশ্বাসে হয় না রে মানুষনিধি’ — এই পদটি মানুষের প্রতি তাঁর গভীর আস্থা ও ভালোবাসার পরিচয় বহন করে। পাঠক! এইসঙ্গে আপনার নিশ্চয় স্মরণে আসবে লালন-সাগরে অবগাহন করে তুলে আনা রবীন্দ্রনাথের মরমি মুক্তা-মণির কথা — তাঁরই স্পর্শমাখা এই সুভাষণটি : ‘মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ’।

বাউলের আবার জাত কী — ধর্ম কী? এসব ধুয়ে মুছে ফেলেই তো সে ঘর-সংসার ছেড়ে ‘মনের মানুষ’কে খুঁজে ফেরার জন্যে ‘সাধবাজারে’ এসে ঠাঁই নিয়েছে। লালনও তো জাত-ধর্ম-শাস্ত্র কিছুই মানেননি, গোত্রবর্ণের বালাই নেই তাঁর কাছে। নারী ও পুরুষ, এই হল মানুষের জাত। এর বাইরে আর কিছু নেই — লালন স্বীকার করেননি। এই সাধক নিজের চোখেই তো দেখেছেন — জাত-ধর্ম আর হিন্দু-মুসলমান — এই ভেদ বিভেদের ফল কী ভয়াবহ — কলহ বিবাদেই জীবন পেলো — এ যেন ‘বসতবাড়ির ঝগড়া-কেজে মিটলো না।’ জাত-ধর্মের সুতো কেটে যৌবনের প্রথম প্রহরেই ঘর ছাড়তে হয়েছিলো। তারপর তো ভাসতে ভাসতে খুঁজে পেলেন ‘তাঁর জীবনেরও জীবন সাঁই’

গুরুকে দীক্ষা নিলেন সিরাজ সাঁইয়ের কাছে – বাউল হলেন – ধর্ম আর জাতের দাবি-দাওয়া রইলো না। কিন্তু তাঁর না থাকলেও, কাছে-কোলের মানুষ যারা তারা তো মানুষের পরিচয় খুঁজে ফেরে জাত-ধর্মের মধ্যেই – মানুষটি হিন্দু না মুসলমান? এঁরা লালনকে জেরবার করে তুলল তাঁর জাত-পরিচয় জানার জন্যে। লালন এড়িয়েও পার পাননি, জবাব দিতেই হল। ‘সব লোকে কয় লালন ফকির হিন্দু কি যবন / লালন বলে আমার আমি না জানি সন্ধান।’ এর পরেও অতৃপ্ত জাত-সন্ধানীদের জানাতে হল জাতপাতের অসারতার কথা – যুক্তি দিয়ে বোঝালেন : ‘বিবিদের নাই মুসলমানী/পৈতা নাই যার সেও তো বাওণী / বোঝ রে ভাই দিব্যজ্ঞানী / লালন তেমনি জাত একখান।’

মধ্যযুগের ভারতের সন্ত-সাধকেরাও তুচ্ছ করেছেন জাতধর্মকে – কী কবীর, রামদাস, কী পল্টু, রজ্জব, তুলসিদাস, কী দাদু সবার মুখেই ওই একই কথা। লালন কী করে পেয়েছিলেন ‘পিঁড়িয় বসে পেঁড়োর খবর’? না কী সব মরমীর মন ও ভাব একই ছাঁচে ঢালা! এখানে স্থান-কাল – সব হারিয়ে যায় – এক অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা থাকে শুধু মানবপ্রেমী সাধকের মরমি মন। ভক্ত কবীর বড়ো ধন্দে পড়েছিলেন, কী করবেন তিনি – পূজা করবেন, না নামাজ পড়বেন। হজ করতে যাবেন, না তীর্থদর্শনে দিন কাটাবেন? অনেক ভেবে শেষে বললেন, ‘ভরম সব ভাগা, এক নিরঞ্জন সু মন লাগা।’ কয়েক শতক পরে বাংলা মূলকে জন্ম নিয়ে লালনেরও তাই মনে হল : ‘যে যা ভাবে সেই রূপে সে হয় / রাম-রহিম-করিম-কালী এক আত্মা জগৎময়।’ জাতবিচারের গর্বকে খারিজ করে নিজেকেই সাক্ষী রেখে সাধক পল্টু বললেন : ‘পল্টু, উঁচি জাতকা, মাং কোই কর অহংকার / সাহেবকা দরবার মে, কেবল ভক্তি পেয়ার’। চেতনা ও বিশ্বাসে লালন তো এঁদেরই উত্তরসূরি, তাই তিনিও বলে উঠলেন : ‘ভক্তির দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই / হিন্দু কি যবন বলে তাঁর জাতের বিচার নাই’।

সমাজ ছিল শ্রেণি-বর্ণ-গোত্রে বিভক্ত – জাতপাতের কঠিন নিগড়ে বাঁধা। লালন তাঁর দ্রোহের আগুনে এসব অসাম্য-পীড়ন-বিভাজনকে পুড়িয়ে ছাই করতে চেয়েছেন : ‘জাত না গেলে পাইনে হরি / কি ছার জাতের গৌরব করি/ ছুঁসনে বলিয়ে/ লালন কয় জাত হাতে পেলে / পুড়াইতাম আগুন দিয়ে।’

লালনের মনে ভাব এলে হামেশাই তাঁর গানে ‘পুনা মাছের ঝাঁক’ আসত। একতারায় আলতো আঙুল বুলিয়ে সুর তুলতেন গলায়। জন্ম নিতো নানা

রঙের নতুন নতুন ভাবের গান। তখন গানে মগ্ন সৌম্য-শান্ত এক মরমি সাধকের অনন্য ছবি আঁকা হয়ে যেতো শিষ্য-শাবকের চোখে। সেই সাধকই একদিন বিচলিত হয়ে উঠলেন – মনের মধ্যে ঝড় উঠল। তাঁর প্রাণের দোসর কুমারখালির কাঙাল হরিনাথকে বাঁচাতে হবে জমিদারের লাঠিয়ালের হাত থেকে। কাঙাল তাঁর ‘গ্রামবার্তা প্রকাশিকা’য় জমিদারের প্রজা-পীড়নের খবর ছেপে এঁদের রোষে পড়েছেন। একতারার বদলে হাতে উঠল বাঁশের লাঠি। ছেঁউড়িয়া থেকে শিষ্য-শাবক নিয়ে লালন ছুটলেন কুমারখালিতে। হাঁকিয়ে দিলেন জমিদারের পাইক-বরকন্দাজকে। প্রাণরক্ষা হল প্রজাদরদি হরিনাথের। এ-কথা শুনলে মনে হবে এ-যেন কোনো কল্প-কাহিনি। কিন্তু না, কাঙাল নিজেই তাঁর ডায়েরিতে লিখে গেছেন এই ঘটনার কথা। সাধক-বাউল বুঝিয়ে দিলেন অত্যাচার-অন্যায়ের প্রতিবাদ করা – সত্য-ন্যায়ের পথে থাকা – মানুষের সন্ত্রম-সম্মান রক্ষাই মানুষের ধর্ম – এ-ও ‘মানুষসত্য’ সাধনারই অঙ্গ। বাউলরা যে সমাজবিচ্ছিন্ন নন – নির্জন সাধনাতেই যে শুধু তাঁদের জীবন কাটে না – এর প্রমাণ তো লালন হাতে-কলমে দিয়ে গেছেন। তাঁর কণ্ঠ বেজে উঠেছে প্রতিবাদের বেদনায় : ‘রাজেশ্বর রাজা যিনি / চোরেরও শিরোমণি / নালিশ জানাবো কার কাছে’ – এ কী শুধুই রূপক-বাস্তবতাবর্জিত তত্ত্বকথা – এখানে কী অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির প্রকাশ একেবারেই ঘটেনি?

নারীর জীবন কেমন ছিল লালনের কালে – আজ থেকে দুশো বছর আগে? নারীকে কী চোখে দেখেছিলেন লালন – এসব কৌতূহল জাগানো প্রশ্নের জবাবে এক নতুন লালনকে খুঁজে পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে বাঙালি নারী প্রথম মুক্তি পেয়েছে সাহিত্যে-প্রেমে-প্রতিবাদে-ব্যক্তিত্বে-আকাঙ্ক্ষায় প্রথম নারীকে আবিষ্কার করা যায় সাহিত্যে – যার সূচনা মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলিতে। এর পাশাপাশি লোকসাহিত্যেও নারীর আলাদা অস্তিত্বের স্বাক্ষর মেলে। কিছুটা পরোক্ষ বা রূপকের মধ্য দিয়ে হলেও বাংলার লোকজ মরমী সাধনা ও সাহিত্যেও – বিশেষ করে বাউলের সাধনা ও গানে নারী তার আপন মহিমা নিয়ে উপস্থিত। বাউলসাধনায় নারীর একটি ভিন্ন গুরুত্ব ও মূল্য আছে। নারী বা প্রকৃতি বাউলের সাধনসঙ্গিনী – সমান মর্যাদার অধিকারী। বাউলমতের উদ্ভবের সঙ্গেও মাধববিবি নামে এক নারীর সম্পর্ক আছে। এই মরমীসাধনার আদিরূপের অনেক গুপ্ত রহস্য নবি-দুহিতা হজরত ফাতেমা (রা:) জানতেন বলেও বাউল-ফকিরদের বিশ্বাস। বাউলের সাধনা ও উপলব্ধিতে নারীর

রূপ-স্বরূপের যে পরিচয়-গুণ-মাহাত্ম্যের যে বৈশিষ্ট্য, তা সবচেয়ে আন্তরিকভাবে প্রকাশ পেয়েছে লালনের গানে।

সৃষ্টিরহস্যের গুপ্তভেদ ভেঙেছেন লালন তাঁর অনেক গানে। নারীই সৃষ্টির আধার। লালন তাই বলেন : ‘সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করলেন সবারি’ – কিন্তু ‘যুগে যুগে মাতা হন যোগেশ্বরী।’ ধাঁধার আবরণ দিয়ে লালন আরো বলেছেন : ‘সাগরে ভাসে জগৎমাতা / লালন বলে মা’র উদরে পিতা জন্মে।’ সমাজ-সংসার-ধর্মের চাপ ও বিধান নারীকে ‘অবলা’ করে রেখেছে। সেই ‘অবলা’ কুলনারীও যে পুরুষের অহংকার-আধিপত্য খর্ব করতে পারে, তার দৃষ্টান্ত একেবারে বিরল নয়। প্রেম-প্রত্যাশী পুরুষকেও যে কখনো কখনো নারীর কাছে নতজানু হতে হয়, কৃষ্ণের তুলনা দিয়ে সেই কথাটি বলেছেন লালন : ‘কোন প্রেমে বল গোপীর দ্বারে / কোন প্রেমে শ্যাম রাধার পায়ে ধরে’...। নারীর মহিমা, শ্রেষ্ঠত্ব ও দৃঢ়তার পরিচয়ের প্রকাশ মেলে লালনের এই গানে : ‘মায়েরে ভজিলে হয় সে বাপের ঠিকানা / নিগম বিচারে সত্য গেল তাই জানা।’ এই বাণী পুরুষতন্ত্রের প্রাধান্যকে চূর্ণ করেছে। নারীর প্রতি লালনের যে শ্রদ্ধা, মনোযোগ ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি তা তাঁর সম্প্রদায়ের দর্শন থেকেই তো এসেছে।

লালন জাত মানেননি - শাস্ত্র মানেননি - প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে আস্থা ছিল না - কোনো সাম্প্রদায়িক পরিচয়েও মতি ছিল না। নির্বিচার অন্ধবিশ্বাসকে খারিজ করে সেখানে যুক্তিকে বসিয়েছেন। তাই সহজেই বলতে পারেন। ‘বেদে কি তার মর্ম জানে’ কিংবা ‘বৈদিক মেঘে ঘোর অন্ধকার / উদয় হয় না দিনমণি’। আচার ও সংস্কার ধর্মকে আচ্ছন্ন করে রাখলে তার কী দশা হয় সে-সম্পর্কে মশকরা করে লালন বলেছেন, ‘ভজা উচিত তবে ছড়ার হাঁড়ি / যাতে শুদ্ধ করে ঠাকুরবাড়ি’। ধর্মের ভড়ংকে ব্যঙ্গ করে আবার গান বেঁধেছেন, ‘বেশ করে বোষ্টমগিরি / রস নাই তার ফষ্টি ভারি / হরি নামের ঢু ঢু তারি / তিনগাছি তার জপের মালা’। আচারনিষ্ঠা ও দানধ্যানের পুণ্যে ধর্ম নেই লালনের মতে : ‘হোম-যজ্ঞ-স্তব-দান-ব্রত/ইহাতে সাঁই নাহি রত’। কোনো বিশেষ ধর্মের গণ্ডিতে তিনি বাঁধা পড়তে চাননি। ‘গোপনে যে বেশ্যার ভাত খায় / তাতে ধর্মের কি ক্ষতি হয়’ – লালনের এই প্রশ্নের জবাব কে দেবে? তাই প্রাতিষ্ঠানিক সব ধর্ম সম্পর্কেই তিনি ছিলেন উদাসীন ও সংশয়ী। কোনো শাস্ত্রেই তাঁর আস্থা ছিল না। ঐশী কেতাব সম্পর্কে তাই তিনি বলেন : ‘এক এক দেশে এক এক

বাণী/ পাঠান কি সাঁই গুণমণি/মানুষের রচনা জানি/লালন ফকির কয়’। কী ভয়ঙ্কর কথা – কী দুঃসাহস। আর এই বক্তব্য পেশ করেছিলেন তিনি এক অজ্ঞ-অজ্ঞান-ধর্মাক্ত সমাজে বাস করে। লালন যদি আজ নব্য-ফাতোয়াবাজদের সামনে এমন কথা উচ্চারণ করতেন, তাহলে তাঁর অবস্থা হয়তো মনসুর হাফিজের মতোই হতো। কথা আরো আছে। পুনরুত্থান-দিবস সম্পর্কেও তাঁর মনে ঘোরতর সন্দেহ জেগেছে : ‘রোজ কেয়ামত বলে সবাই / কেউ বলে না তারিখ নির্ণয় / হিসাব হবে কি হচ্ছে ও সদায়/ কোন কথায় মন রাখি রাজি।’ মে’রাজ সম্পর্কেও তিনি প্রশ্ন তুলেছেন : ‘মেয়রাজের কথা শুধাবো কারে / আদম তন আর নিরুপ খোদা / নিরাকারে মিলল কি করে।’ মক্কায় না গিয়ে ‘দিল-কাবা’য় হজ করতে বলেছেন তিনি। নামাজ সম্পর্কেও তিনি যে কথা বলেছেন তা শরিয়তের চোখে ঘোর আপত্তিকর : ‘পড়গে নামাজ জেনে শুনে/ নিয়ত বাঁধগে মানুষ-মক্কা পানে’। দ্বিত্ববাদের ধারণা প্রশ্নয় পেয়েছে তাঁর চিন্তায় : ‘যেহি মুরশিদ সেই খোদা কিংবা ‘আল্লা-নবি দুটি অবতার’। মুসলমান ‘জল’ খায় না, হিন্দু ‘পানি’ পান করে না। কিন্তু লালন অনিচ্ছুক হিন্দু-মুসলমানকে এক ঘাটের ‘পানি’ ও ‘জল’ খাইয়ে ছেড়েছেন তাঁর গানে সমার্থক এই দুটি শব্দই সাদরে সমান মর্যাদায় গ্রহণ করে। জাতধর্মের প্রশ্নয়ে লালিত ভাষা-সাম্প্রদায়িকতার গোড়াও এইভাবেই কেটে দিয়েছেন তিনি। এরপরেও কী কেউ বলবেন সাধকজীবনে আসার পর লালন বিশুদ্ধ হিন্দু কিংবা নিষ্ঠ মুসলমান ছিলেন? তাঁর ভাষ্যে এই বার্তাই পৌছে যায়, তিনি না ছিলেন হিন্দু, না ছিলেন মুসলমান, তার বদলে প্রাণপণে ‘মানুষ’ হতে চেয়েছেন। এই দুই সম্প্রদায়ের ধর্মকেই তিনি জানার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু মান্য করার কারণ বা যুক্তি খুঁজে পাননি।

পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক এসব বিষয়কেও লালন মোটেই আমল দেননি। পাপ-পুণ্যের ধারণাকে তিনি ‘দেশাচার’ বলে গণ্য করেছেন : ‘পাপ-পুণ্যের কথা আমি কারে বা শুধাই / এই দেশে যা পাপ গণ্য অন্য দেশে পুণ্য তাই’। পাঠক! মনে পড়ে, বিদ্যাসাগর একবার বুলন্দ-আওয়াজে ঘোষণা করেছিলেন : ‘আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি।’ তারো আগে লালনের মনে এই ভাবটিই তো জেগেছিল। মুসলমানের ‘ভেস্তু’ (বেহেশত) বা হিন্দুর ‘স্বর্গ’ লালন কোথাও যেতে চাননি, এ দুই-ই তাঁর কাছে ‘ফটক সমান’ মনে হয়েছে। এই হাজতখানার বাসিন্দে হতে ‘কার বা তা ভাল লাগে’।

লালন ছিলেন কালের অগ্রগামী পুরুষ। কিন্তু কাল বিরোধী ছিল। সমাজ-মন তৈরি ছিল না তাঁর কথা শোনা কিংবা তার তাৎপর্য বোঝার জন্য। তাই তাঁকে অনেক আঘাত সহ্যেতে হয়েছে। মনের মধ্যে কখনো বেদনা – কখনো হতাশা জেগেছে, তাই হাহাকার আর দীর্ঘশ্বাস মিশিয়ে গান রচনা করেছেন : ‘এ দেশেতে এই সুখ হলো আবার কোথা যাই না জানি / পেয়েছি এক ভাঙা নৌকো জনম গেল ছেঁচতে পানি’। কিন্তু মানবগুরু লালন তো পরাভব মানতে পারেন না, হতাশার কাছে আত্মসমর্পণ তো তাঁর ধর্ম হতে পারে না। যাঁর তরঙ্গমুখর নদী হওয়ার বাসনা ছিল – দু’কূল ভাসানো স্রোতস্থিনী হওয়ার কথা ছিল, তিনি কীনা হয়ে রইলেন ‘আফেলা পুকুরে’র বন্ধ ‘কূপজল’! কিন্তু লালন তো মানুষকে দিশা দিতে চান, তাই সুসময়ের জন্যে আশা জাগিয়ে রাখেন : ‘কবে হবে সজল বরষা, রেখেছি মন সেই ভরসা’। একদিন বর্ষা নামবে, নব-জলধারায় সিক্ত হবে এই রক্ষ মাটি, সবুজে ভরে যাবে ফসলের মাঠ – সত্য হয়ে উঠবে লালনের স্বপ্ন।

উনিশ শতকে বাঙালি ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছিল। সেই ঘুম-ভাঙানিয়া ফেরিঅলা ছিলেন রামমোহন। কিন্তু তাঁর ডাক তো শুনেছিলেন শুধু কলকাতার মানুষ আর তার প্রতিধ্বনি জেগেছিল বাংলার দু’চারটি বড়ো মফস্বল শহরে। কিন্তু আঁধারে ঢাকা পড়ে রইলো বৃহত্তর বঙ্গদেশের গ্রামের পর গ্রাম। সেই গ্রামদেশে মাটির প্রদীপ জ্বালালেন লালন ফকির। প্রতিক্রিয়ার দমকা হাওয়ায় বারবার সেই আলো নিভে যেতে চায়, লালন বুক দিয়ে আগলে রেখে সেই আলোর শিখার বলয় প্রসারিত করলেন বিশাল বাংলায়। রামমোহন নিজে লেখাপড়া জানতেন, তাঁর অনুসারীরাও, তাই তাঁর কীর্তি-কর্মের কথা পাঁচমুখে প্রচার পেল। কিন্তু উচ্চবর্ণের ভদ্রজনের উপেক্ষা-অবেহলায় লালন চাপা পড়লেন। কে তাঁর কথা বলবে? পেশাদার ইতিহাসবিদরা এ বিষয়ে নীরব হয়ে রইলেন বাংলার সামাজিক ইতিহাস লিখতে গিয়ে। একবার অমলেন্দু দে কথটি তুলেছিলেন আর অনন্যদৃষ্টের রায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন : ‘বাংলার নবজাগরণে রামমোহনের যে গুরুত্ব বাংলার লোকমানসের দেয়ালী উৎসবে লালনেরও সেই গুরুত্ব।’

লালন ফিরে এসেছেন দু’শতকেরও বেশি পথ উজানে পাড়ি দিয়ে, প্রদোষের আলো-আঁধারিতে ছায়ামূর্তির মতো তাঁকে দেখায়। কিন্তু তাঁকে ঘরে তুলে নেওয়ার – আসন পেতে বসতে দেওয়ার লোক কই? লালন ঠাঁই দাঁড়িয়ে

আছেন। একটা বড়ো শ্বাস ফেলে ফিসফিস করে থেমে থেমে বললেন : ‘দ্যাশটা ঘুরে আলাম। কিন্তু কইরে, মানুষ তো দ্যাখলাম না, কেউ হিন্দু কেউ মুসলমান, মানুষ কই? সবাই দেখি শান্তর পড়ছে, ধম্মকন্মে ভারি মতি, কিন্তু মনে তো সব গিল্লদ পুরা! শহরে-গিরামে কতো কলের বাতি – কিন্তু অ্যাতো আঁধার ক্যান রে, তোদের মনের বাতি জ্বালবি কবে? তুরা কী সব মরে বাঁইচে আছিস! গান কই – দিল্ জাগানো গান – সত্য সুপথের গান – পিরিতি অমূল্যনিধির গান? ওরে ভুলাই, শীতল, মনিরুদ্দীন শিগগির ছুটে আয় – জ্যাস্তে-মরাদের জাগাতি হবি যে। ওরে আয় তোরা সব – গান ধর – মানুষির গান – মানুষ হওয়ার গান ...।’

লালন আমাদের দরোজায় দাঁড়িয়ে – তাঁকে কি আজ আমরা ফিরিয়ে দেব?

প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ

মায়েরে ভজিলে হয় সে বাপের ঠিকানা
নিগম বিচারে সত্য গেল তাই জানা।।
পুরুষ পরওয়ার দিগার
অঙ্গে ছিল প্রকৃতি তার
প্রকৃতি প্রকৃতি সংসার
সৃষ্টি সবজনা।

সন্ন্যাস প্রাপ্তি : খেলকা পরানোর উপলক্ষ

[বাউল-ফকির সাধনায় সন্ন্যাস প্রাপ্তি বা খেলকা (বা খেরকা) পরানো একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। এরকমই একটি অনুষ্ঠানের মনোগ্রাহী বিবরণ দিয়েছেন আবুল আহসান চৌধুরী। তাঁরই একটি পুরনো লেখা থেকে এই অংশটি পুনর্মুদ্রিত হল। স.]

সাধনায় প্রবেশের জন্য বাউলকে গুরুর কাছে দীক্ষা নিতে হয়। একেক ঘরানার একেক পন্থা আর পদ্ধতি। লালনীয় মতে গুরু তিনবার কলেমা হক পাঠ করিয়ে ঘরে তোলেন দীক্ষার্থীকে। গুরুর হাত থেকে চাল-পানি 'সেবা' গ্রহণের পর দীক্ষাকরণ পূর্ণ হয়। এরপর চলে সাঁইজির নাম গান। সবশেষে সাধুগুরুর চরণে নিবেদিত হয় সাধ্য- 'সেবা'। সাধারণত দীক্ষার এই অনুষ্ঠান গুরু বা শিষ্যের বাড়ি কিংবা লালন সাঁইজির ধামে হয়ে থাকে।

দীক্ষার পর শুরু হয় শিষ্যের পরীক্ষাকাল। গুরুর নির্দেশে চলতে থাকে সাধন-ভজনের ত্রিা্যাকরণ। শিষ্য সাধনার 'স্থল' বা 'ফাশফির শেখ' অতিক্রম করলে ভেক-খিলাফতের যোগ্য হয়ে ওঠেন। দীক্ষাগুরু কিংবা তাঁর অবর্তমানে গুরু-মা খিলাফত দিয়ে থাকেন। এঁদের উভয়ের অনুপস্থিতিতে তৃতীয় একজন সাধু এই দায়িত্ব পালন করতে পারেন। তবে তাঁকে পাঁচজন সাধুগুরুর সম্মতি নিতে হয়। খিলাফতের অনুষ্ঠানটি লালন সাঁইয়ের মাজারে হলে তার আকর্ষণ, গুরুত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, তবে অন্যত্র হতেও বাধা নেই।

লালন সাঁইয়ের মৃত্যুশতবর্ষ উৎসবের দু'দিন পরে (১৯ অক্টোবর ১৯৯০/ ৪ কার্তিক ১৩৯৭) লালন - মাজার প্রাঙ্গণে এক বর্ণাঢ্য খিলাফত-দান অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। শুক্রবার সকাল দশটা। লালন - মাজার প্রাঙ্গণে কৌতূহলী মানুষের ভিড় জমেছে। তিল ঠাই নেই। উৎফুল্ল শিষ্যের দল, সাধু-গুরুর মধ্যে ব্যস্ততা। আজ পুরুষ ও প্রকৃতির যুগল-খিলাফত হবে। দম্পতির নাম আবুবকর সিদ্দিকী ও রহিমা খাতুন ওরফে পারফল, নিবাস জেলা যশোরের বিকরগাছার কালিয়া গ্রামে। খিলাফত দেবেন প্রবীণ বাউলসাধক

ফকির গোলাম ইয়াসিন শাহ। অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব মাজারের খাদেম নিজাম শাহ ফকিরের।

মাজার-আঙিনার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে সবাই এসে জড়ো হয়েছেন। চারজন সাধু চাঁদোয়ার চারকোণা ধরে রয়েছেন। সৌম্য-সুঠাম দীর্ঘদেহী আবুবকরকে এনে দাঁড় করানো হল চাঁদোয়ার তলায়। লম্বা বাবরি ও ঘন কৃষ্ণ শ্মশ্রু গৌরবর্ণের ছটাকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে। আমগাছের পাতার ফাঁক গলে নেমে আসা সূর্যের আভাষ বলমল করছে সারা শরীর। আবুবকরের এতদিনের শরীয়তি পোশাক খুলে নিয়ে পরিয়ে দেওয়া হল ‘খিলকা’ নামের সেলাইবিহীন একখণ্ড সাদা কাপড় আর সাদা তহবন্দ। পরানো হল ‘ডোরকপনি’ লেঙ্গটি বা নেংটি : রুদ্ধ হল কামের ঘর আর সৃষ্টির দ্বার। কাঁধে উঠল আঁচলা ঝোলা। গুরুমা গলায় পরালেন সাদা তসবিহ বা জপমালা। মাথায় বাঁধা হল সাদা পাগড়ি বা তাজ। সব কিছুতেই সাদা রঙের ব্যবহার এক বিশেষ প্রতীকী তাৎপর্য তুলে ধরে। হাতে ধরিয়ে দেওয়া হল জলপাত্র ও একটি ছড়ি। এবারে আনা হল তাঁর ধর্মপত্নী পারুলকে। পাড়বিহীন সাদা কাপড়ে জড়ানো হল তাঁর শরীর, গায়ে চড়ল ‘খিলকা’। একে একে তাঁকেও পরানো হল ভেক-খিলাফতের পোশাক। মৃতের অস্তিম-যাত্রা সাজে সাজলেন তাঁরা, ‘জিন্দা দেহে মরার বসন’। নিম্নস্বরে কলমা বা মন্ত্র পাঠ করালেন খাদেম নিজাম শাহ। জীবিতের জানাজা শেষ হলে সকল দুর্কর্ম ও পাপ থেকে দূরে থাকার হুকুম হিসেবে সাদা কাপড় দিয়ে দু’জনের চোখ ও হাত বেঁধে দেওয়া হল। এরপর গুরু গোলাম ইয়াসিন শাহ কম্পিত হাতে মাজার-আঙিনায় একমুঠো চাল ছিটিয়ে দিয়ে বললেন, ‘ভূ-মণ্ডলে ছড়িয়ে দিলাম তোমাদের দানা, খুঁটে খাও।’ পারুল-আবুবকর গুরুর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে ভক্তি দিলেন। সকল মায়া - মোহ থেকে আজ তাঁরা মুক্ত হলেন। স্বজন সংসারের কোনো দাবি আর তাঁদের কাছে রইল না। জীবন-মরণ, সাধ-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা সব কিছু আজ তাঁরা সঁপে দিলেন সাইজির চরণে। জগৎ-সংসারের কাছে তাঁরা আজ মৃত। এ বার শেষ দৃশ্য। হাত চোখ বাঁধা পারুল - আবুবকরকে গুরুমা আর খাদেমের সেবাদাসী ধীর পায়ে নিয়ে গেলেন সাইজির সমাধি-ঘরের পাশে, সাতবার তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করতে হবে। তাঁদের পেছনে সাধুগুরুর দল, একতারা-খঞ্জরি-জুড়ি হাতে নিয়ে ভক্ত-শিষ্যেরা গাইছেন দেল দরিয়ায় তুফান তোলা ভেক-খিলাফতের সেই গানটি :

কে তোমারে এ বেশ-ভূষণে সাজাইল
বলো শুনি।

জিন্দা দেহে মরার বসন খিলকা - তাজ আর
ডোর - কোপিনী।

জিন্দা-মরার পোশাক পরা
আপন ছুরাত আপনি সারা
ভবলোককে ধ্বংস করা
দেখে অসম্ভব করণি।।

যে মরণের আগে মরে
শমনে ছোঁবে না তারে
শুনেছি সাধুর দ্বারে

তাই বুঝি করেছে ধনি।

এক মর্মস্পর্শী দৃশ্য। শেষযাত্রার সাজ-পরা দুটি অসহায় মানুষের ভব-বন্ধন জ্বালা থেকে মুক্তিলাভের জন্য এক নতুন গন্তব্যে পথচলা শুরু হল। কারো চোখ শুষ্ক নয়। গোলাম ইয়াসিন শাহ থরথর করে কাঁপছেন, চোখের জলে ভিজে গেছে তাঁর শ্বেত-শুভ্র বসন। হিরু শাহ দরদ লাগিয়ে শেষ অন্তরা ধরেছেন :

সেজেছে সাজ ভালই তরো
মরে যদি বাঁচতে পারো
লালন বলে যদি ফেরো

দুকুল হবে অপমানি।

গানের সুর এক আশ্চর্য কান্না-ভেজা অনুভূতি দিয়েছে ছড়িয়ে। রচিত হয়েছে বিধুর আবহ। বুকের ভেতর টন্টন করে উঠেছে এক অজানা বেদনায়। তাওয়াফ শেষ হল, গান থামল।

সাধু ভাগ্যের এই গানের রেশ কারো মন থেকে মুছে গেল না।

এরপর শুরু হল গ্রাম-পরিগ্রাম ও ভিক্ষা-সংগ্রহ। আঁচলা-ঝোলা নিয়ে আগে আগে চলেছেন পারুল-আবুবকর। পেছনে সাধুগুরুর, শিষ্যভক্ত, অনুরাগীদের মিছিল। আর আছে গানের দল। ছেঁউড়িয়ার ঘরে ঘরে গিয়ে তাঁরা ভিখ মাগলেন। গেরস্থবাড়ির বউ-ঝিরা কেউ দিলেন মুষ্টির চাল, কেউ টাকা - পয়সা, কেউবা গাছের আনাজ-ফল। ছেঁউড়িয়ার আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে

উঠেছে ভেকভিক্ষার সেই গানে :

কাঙাল হব মেঙে খাব রাজ-রাজ্যের আর কার্য নাই।

কৌপিন দে গো ভারতী গোঁসাই আজ আমায়।।

পারুল-আবুবকর ভিক্ষা শেষে ফিরে গেলেন গুরুগৃহে। নিয়ম রক্ষার জন্য সাতদিন থাকতে হবে। পরে আমরাও হাজির হলাম সেখানে। ফকির গোলাম ইয়াসিন শাহের বাড়ি ছেঁউড়িয়া গ্রামের কারিকরপাড়ার এক প্রান্তে। চারপাশে গাছ-গাছালি, সুপারি-নারকেলের সারি। নিকোনো উঠানের মাঝখানে মেরাপ বাঁধা হয়েছে, সাধুসেবা হবে। সবাই ব্যস্ত। রান্নার আয়োজন চলছে। একপাশে লাউ, বেগুন আর মিঠে কুমড়োর 'ডাঙ'। মাছ-কুটুনি বসে আছেন গুরুর পায়ের কাছে, চারপাশে সাধুগুরুর দল। পারুল রান্নার যোগান দিচ্ছেন। দুজনের চোখে মুখেই প্রাপ্তির আনন্দ — নতুন উপলব্ধির প্রশান্তি। বৈষ্ণবীয় ও দরবেশী — ভেক-খিলাফতের এই হল দুটো ধারা। আবুবকর-পারুলের খিলাফত হল বৈষ্ণবীয় পন্থায়। 'কাঙাল হব মেঙে খাব' এ হল ভেকের গান। আর দরবেশী-মতের খিলাফতে গাওয়া হয় লালন সাঁইজির 'কপাট মারো কামের ঘরে, মানুষ ঝলক্ দেবে রূপনিহারে' ও সেইসঙ্গে 'দেখ না মন বাকমারি এই দুনিয়াদারি পরিয়ে কপ্‌নিধ্বজা মজা উড়াল ফকিরি'। ভেকে আঁচলা-ঝোলা, খিলাফতে শুধু আঁচলা। ভেকে 'ভিক্ষা' আর খিলাফতে 'নজরানা'। বুঝলাম, সময়ের বিবর্তনে গুরুর উপলব্ধি-ভেদে এইভাবে একই ঘরানার শিক্ষা-দীক্ষা বা করণ-কারণে ভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে।

বাণিজ্য করিতে গেলে দূর দেশে
খাঁটি সোনা-রূপা কিনলে মেজে ঘষে
তোমার কপাল গুণে হয় তামা-দস্তা-শিসে
হীরে কিনলে হয় জিরে
হরি দুখ দাও যে জনা রে

আগে দেহের খবর জানরে আমার মন।
দেহতত্ত্ব না জানিলে জনম যাবে অকারণ।।
দেহ বৃক্ষের পাঁচটি শাখা
দশ ডালে তার দশটি পাতা,
সেই না বৃক্ষে বসে আছে মহানন্দে মহাজন।।

লালন আমার মুক্তির সনদ সুদীপ সিংহ

[কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়ায় নিভে গেল একটি লালন-অন্ত প্রাণ, সম্প্রতি প্রয়াত হলেন ফকির আনোয়ার হোসেন মন্টু শাহ। লালনচর্চার ক্ষেত্রে এ এক অপূরণীয় ক্ষতি। মন্টু শাহের সন্ধান প্রথম পাই বাংলাদেশের প্রখ্যাত চিত্র-পরিচালক তানভির মোকাম্মেলের কাছে। তাঁর নির্মিত দুটি ছায়াচিত্রে অভিনয়ও করেছিলেন মন্টু শাহ – ‘অচিন পাখি’তে স্ব-ভূমিকায় এবং ‘লালন’-এ মনিরুদ্দিন শাহের ভূমিকায়। আশ্চর্য সমাপতন, লালনের গানগুলি লিখে রাখার দায়িত্ব যেমন ছিল মনিরুদ্দিনের উপর, বাস্তবে ঠিক সেইভাবে সারাটা জীবন ধরে লালনের গান খুঁজে বেরিয়েছেন মন্টু শাহ। সেইসব গান সংগৃহীত করে প্রকাশ করেছেন ‘লালন সংগীত’-এর তিনটি খণ্ড। লালনে সম্পৃক্ত ছোটোখাটো মানুষটিকে দেখে বোঝার উপায় ছিল না লালন সম্পর্কে কতখানি প্রগাঢ় ছিল তাঁর পাণ্ডিত্য... লালনের প্রতি তাঁর ভালোবাসা।

তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে আমার পরম সৌভাগ্য হয় পঁচাত্তর বছরের এই যুবকের সঙ্গে দেখা করার। লালনকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছিল সেদিনের আলোচনা। সহজ এবং অকপট বাচনে তিনি বলেছিলেন অনেক কথা। তাঁর কণ্ঠে সুর ছিল না, কিন্তু স্মৃতি থেকে অনায়াসে কবিতার মতো বলে যেতেন লালনের গান। কথোপকথনে উঠে আসা লালনগীতিগুলি তাঁর স্মৃতিনির্ভর, মনে রাখতে হবে সেটা। তাঁর জবানিকে সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত রেখে সাক্ষাৎকারটি নিচে লিপিবদ্ধ করা হল।]

প্রশ্ন : লালনের প্রসঙ্গে আসার আগে একটা প্রশ্ন করি আপনাকে।
দুদু শাহের গানে পাই – ‘যে খোঁজে মানুষে খোদা সেই তো বাউল’। ‘বাউল’ শব্দের ব্যাখ্যা আপনি কীভাবে করবেন?

উত্তর : 'বা' মানে বাতাস আর 'উল' মানে সন্ধান। লালন সাঁই তাই বললেন--

হাওয়া ধর, অগ্নি স্থির কর
মরিলেও বাঁচিতে পার।
বারে বারে করি রে মানা
লীলার বশে বাস কর না
রেখ তেজের ঘর তেজিয়ানা
উর্ধ্বচাঁদ বয়ে।
জান না মন পারাহীন দর্পণ
তাকে কি হয় রূপ দরশন
অতি বিনয় করে বলছে লালন
থেক ঝঁশিয়ার।

হাওয়াতেই তো সব মানুষ, পশু, জীবাদি আমরা সব বেঁচে
আছি। হাওয়া যদি একঘণ্টা না থাকে তাহলে তো আমরা
থাকব না।

প্রশ্ন : লালনের প্রতি আপনার আকর্ষণ কবে থেকে?

উত্তর : লালনের প্রতি আমার আকর্ষণ ... যখন আমার বারো-চোদ্দ
বছর বয়স, আমি একদিন নদী থেকে এলাম। কাদা-টাঁদা পায়ে
আছে। ঘরের পাশেই কুয়ো, কুয়ো থেকে পানি ওঠালাম। এক
বালতি পানি লাগল আমার সেই কাদা-টাঁদা সরাতে। তখন
আমার দাদি বললেন – 'এই পানির বিচার হবে। পানি বেশি
ব্যয় করলে তার শাস্তি হবে'। আমি কথটা বুঝলাম না। তখন
লালন সাঁইয়ের মাজারে ছিলেন একজন মহিলা, নাম শান্তি
মা। খুবই গুণী মানুষ। আর আমার গুরু ছিলেন ফকির
কোকিল সাঁই। কুষ্টিয়া টাউনে আমার বাবার মুদিখানার দোকান
ছিল। উনি (কোকিল সাঁই) প্রায়দিনই সকালে বেড়াতে
বেড়াতে যেতেন ওখানে, গিয়ে বসতেন। তা আমি ওনাকে
বললাম যে, দাদি বলেছেন পানির বিচার হবে। পানি

অতিরিক্ত ব্যয় করলে তার শাস্তি হবে। তখন আমার গুরু
বললেন – 'বাবা, ওই পানি তো না। এই দেহতে পানি আছে।
যখন বয়সপ্রাপ্ত হবে তখন সেই পানির বিচার হবে। এ পানি
নয়'। এ ছিল লালনের বাণী, তখন থেকেই যা আমার মনে
রেখাপাত করে। আমার গুরু বললেন – 'লালনের এই
বাণীগুলো তুমি সংগ্রহ কর আর এইগুলো তুমি বুঝবিচার কর।
তাহলে তুমি সেই পানির সন্ধান পাবা'। তখন থেকেই আমি
সাঁইজির গান সংগ্রহ শুরু করি এবং ১৯৬০ সালের মার্চ মাসে
দোলপূর্ণিমায় আমার গুরু কোকিল সাঁইয়ের কাছে আমি
দীক্ষাগ্রহণ করলাম। দুর্লভ শাহ (ছেঁউড়িয়ার একজন অন্ধ
ফকির, বয়স শতাধিক বলে দাবি করেন) আর আমি একই
দিনে, একই সময়ে দীক্ষা নিই।

আমাদের গুরু প্রথমে দুর্লভ শাহকে মস্তপাঠ করালেন, তারপর
আমাকে। সেই থেকে আমার গুরুর কাছে আমি মতবিনিময়
করি এবং আমার গুরু এই জ্ঞানদান করলেন যে, মানুষের
দেহরতিই হচ্ছে আসল। এতেই মানুষ জীবিত থাকে, এতেই
মানুষ সুস্থ থাকে। এই দেহকেদ্রের যে পানি, সেই পানি সরে
গেলে তখন আর কিছু থাকে না। তাই লালন সাঁইজি
বললেন—

গেড়ে গাঙ্গেরে খ্যাপা করছ মজা
হায় কী রে মজা যাবে বুঝা কার্তিকের এই উলানির কালে।
তাবিজ-তাগা বাঁধবি গলে
মস্তকের জল শুদ্ধ হলে।
তাতে কি তোর অসুখ হবে রে ভালায়।
বায়-চালা দেয় ঘড়ি ঘড়ি
ডুব পাড়িস কেন তাড়াতাড়ি
প্রবল হবে কফের নাড়ি
যাতে হানি জীবনমূলে।
ক্ষান্ত দে রে বাঁপই খেলা

শাস্ত হ রে ও মন ভোলা
দেখ দেখি চক্ষু মেলে
লালন কয় আছে বেলা।

তো বাবা, এইটা সংরক্ষণ করতে পারলে তোমার আত্মার
মুক্তি হবে। আর এইটা সংরক্ষণ করতে না পারলে তোমার
দেহ ধ্বংস হবে, সমস্ত রোগব্যাদি এসে হাজির হবে।

বায়-চালা দেয় ঘড়ি ঘড়ি
ডুব পাড়িস কেন তাড়াতাড়ি
প্রবল হবে কফের নাড়ি
যাতে হানি জীবনমূলে --

বিচার হবে ওই পানির। তো সেই থেকেই আমি গুরুবাক্যের
উপর সংযমী হয়ে আছি।

প্রশ্ন : আপনি আর দুর্লভ শাহ একই দিনে দীক্ষা নিলেন। আপনাদের
কি খিলাফত হয়েছিল?

উত্তর : খিলাফত আমার গুরু আমাকেই আগে দিয়েছেন। আমার
খিলাফত হয়েছে আশি সালে আর দুর্লভকে উনি খিলাফত
দিয়েছেন তার দশ বছর পরে।

প্রশ্ন : ‘আপন সাধন কথা না কহিও যথাতথা’ -- লালন স্বয়ং বলে
গেছেন একথা। এই যে জটিল দেহতত্ত্বের কথা, তার
ভিতরের মানেটা তো আমরা ধরতে পারি না। সেটা তাহলে
আপনি মুর্শিদ ধরার পরেই বুঝলেন?

উত্তর : (হাসি) ১৯৩৬ সালে আমার জন্ম। ১৯৬০ সালে আমি যখন
দীক্ষা নিয়েছি, আমার বয়স ২৪ বছর। তারপর গুরু আমাকে
আন্তে আন্তে সব বোঝালেন।

প্রশ্ন : লালনকে আপনি কীভাবে বুঝেছেন?

উত্তর : লালনকে আমি আমার মুক্তির সনদ হিসেবে বিশ্বাস করেছি,
মেনেছি এবং সেই বিশ্বাসেই আছি।

প্রশ্ন : অর্থাৎ আপনি আপনার নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে লালনকে জড়িয়ে
নিয়েছেন।

উত্তর : অবশ্য। সাঁইজি তো বললেন --

ও মন বল রে সদাই লা ইলাহা ইল্লেল্লাহ
লা ইল্লাহা নফিসে হয় ইল্লেলাহ সে দীন দয়াময়।

এই যে ‘লা ইলাহা’ এই হাওয়াটা ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে।
‘ইল্লেল্লাহ’, ধারণ করা হচ্ছে। তাহলে ধারণটা করছে কে?
বাতাসের যে মূল মালিক অর্থাৎ স্বয়ং আল্লা, সেই কিন্তু এই
হাওয়ায় আসছে আর বেরিয়ে যাচ্ছে। ‘লা ইলাহা’ এই তন্
অর্থাৎ দেহ আর ‘ইল্লেলাহ’ জীবন। সেইজন্য সকল সাধক -
আউলিয়া - দরবেশ যারা, সবাই লা ইলাহা ইল্লেল্লাহ ... লা
ইলাহা নফিসে হয় অর্থাৎ ছেড়ে দেওয়া হয় আর ইল্লেল্লাহ
ধারণ করা হয়।

প্রশ্ন : এই যে দমের খেলা...

উত্তর : হাওয়ার খেলা।

প্রশ্ন : হ্যাঁ, এই যে হাওয়ার খেলা, এ-তো তরিকায় না থাকলে জানা
যায় না।

উত্তর : তা তো বটেই।

প্রশ্ন : হাওয়ার কথা যখন উঠল তখন একটা প্রশ্ন করি। এই যে
অনেকে তরিকায় থেকেও গঞ্জিকা সেবন করছেন...

উত্তর : নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন সাঁইজি। সাঁইজি আগে বলেছিলেন
- ‘লালন কয় গৌজেলের খেলার কলকেগুলি সার হল রে’।
পরে মনিরুদ্দিন শাহকে ডেকে বললেন - ‘মনিরুদ্দিন, মহাদেব

যখন গঞ্জিকা সেবন করতেন তখন কারও ধর্মের উপর আঘাত করার অধিকার তো কারও নেই। অতএব ওইটা পালটে কর – লালন কয় আমার খেলার ডান্ডাগুলি সার হল রে।’ সাঁইজির শিষ্য উজল শাহ যখন আখড়ায় গঞ্জিকা সেবন করেছিলেন, তখন মনিরুদ্দিন তাঁকে বলেছিলেন – ‘উজল। এই আজকে গুরুবার, বৃহস্পতিবার। আজকে থেকে আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত তুমি এই গঞ্জিকা সেবন ত্যাগ কর, সাঁইজির আদেশ’। তো পরের গুরুবারে তাঁকে যখন অন্যান্য ভক্তরা নিয়ে এসে একসঙ্গে বসলেন, তখন সাঁইজি বললেন – ‘তোমাকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তা তুমি লঙ্ঘন করেছ। তাই তোমাকে আমি উত্তের থেকে খারিজ করলাম, ত্যাগ করলাম। তুমি আমার এই আখড়াবাড়ি থেকে অন্য স্তরে স্থান নাও।’ আর ওই পনেরোজনকে উপদেশ দিলেন যে, উজলের যা কিছু আছে সব রাস্তায় বের করে দিয়ে আসতে, ওর যেখানে ভালো লাগে সেখানেই যাক। উজল তারপর এখান থেকে বিদায় নিয়ে পাবনায় ছিল কয়েকবছর। সাঁইজির দেহত্যাগের পর আবার ফিরে এসেছিল। এখানে তখন গদিনসীন ছিলেন সাঁইজির পালিত বড়ো পুত্র (ছোটো পুত্র ভোলাই শাহ) শীতল শাহ। শীতল শাহ বললেন – ‘না। সাঁইজি যখন তাঁকে বিদায় করে দিয়েছেন আমরা আর স্থান দিতে পারি না। সাঁইজির বাক্য আমরা লঙ্ঘন করতে পারব না’। মাজারের উত্তরে একটা জমি খরিদ করে উজল সেখানেই শেষজীবনটা কাটায়। এই পর্যন্ত আমরা শুনেছি এবং ওনার দাফন হয়েছিল যে বেলগাছটার নীচে, সেই বেলগাছটাও ছিল বহুদিন। এখন যারা বাড়ি করেছে কেটেকুটে পুড়িয়ে দিয়েছে।

স্থানীয় কিছু মানুষ ঢুকে এলেন ঘরে, অভিবাদন জানালেন মন্টু শাহকে। তাঁদের কথোপকথনে বোকা গেল এলাকার একজন মান্যগণ্য মানুষ মন্টু শাহ। যে কোনও স্থানীয় সমস্যার সমাধানে তাঁর দ্বারস্থ হয় এলাকাবাসী। আমাদের সঙ্গে

কুশল বিনিময়ের পর তাঁরা বিদায় নিলে ফের শুরু হল কথাবার্তা।

প্রশ্ন : আপনি এতদিন ধরে দেখছেন লালন সাঁইয়ের মাজার, পুরোনো গল্প কিছু বলুন না।

উত্তর : অমুক যে ছেলেটা এসেছিল এখন (একজনের নামোল্লেখ করলেন), ওর পূর্বপুরুষ ছিলেন ছুটির শাহ। আমার বাবার ঠাকুরদাদার চাচাতো ভাই। কিন্তু এই গ্রামের মধ্যে সে ধনাত্য ব্যক্তি ছিল। চাউলের ব্যবসা ছিল। নর্থ বেঙ্গল থেকে চাউল আসত আর এখানে সে বিক্রয় দিত। কিন্তু তাঁরই ওয়ারিশসূত্রে যারা আছে এরা সবাই মাংসাশী। এর দাদা বিরাট হোসেন বিশ্বাস যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন সে কাঁদেনি, দুধও খায়নি। তাঁর বাবা ছুটির শাহ ছিলেন সাঁইজির নিজের হাতে দীক্ষায়িত শিষ্য। তিনি গিয়ে সাঁইজিকে একথা জানাতে তিনি নিজেই চলে এলেন। বললেন – ‘এই শালা দুধ খা। শালা তুমি ব্রাহ্মণের ঘর থেকে এসেছ যবনের ঘরে আর তুমি দুধ খাবা না’। তারপর দুধ খাওয়া শুরু করে শিশু। ছুটির শাহের মতো আমার বাবার দাদাও লালন সাঁইয়ের হাতে দীক্ষায়িত শিষ্য ছিল। তো সাঁইজির উফতের (মৃত্যুর) পরে ওখানে বিল্ডিং করা নিয়ে বিরোধ হল। শীতল শাহ, ভোলাই শাহ তাঁরা বললেন – ‘সাঁইজির সিন্দুকে ২৬০০ টাকা আছে, এই টাকা দিয়েই আমরা বিল্ডিং করব।’ আর মনিরুদ্দিন শাহ, মানিক শাহ সাঁইজির দেহত্যাগের পর বোলপুর গিয়ে সাক্ষাৎ করেছিলেন জমিদারমশাইয়ের সাথে। ঠাকুরবাবু বলেছিলেন যে প্রকৌশলী দিয়ে একটা নকশা করে বিল্ডিংটা করা হবে। এদিকে শীতল শাহ আর ভোলাই শাহ বললেন – ‘না, আমরা তা করব না। তা করলে তো এই সমাধি জমিদারি এস্টেটের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। আমরা শিষ্য-ভক্ত। আমাদের যা সামর্থ্য আছে সেই দিয়েই আমরা এই সমাধি গড়ব।’ মাজার থেকে আসতে ডানদিকে যে গলিটা গেল ওই মোড়ের উপরেই শীতল শাহ ভোলাই শাহ ইটভাটা করেছিল। সেই ইটভাটা থেকে ইট

কেটে পুড়িয়ে ওই সমাধি হয়েছিল। সেই সমাধি থেকে বিশ হাত দূরে সাঁইজির থাকবার ঘর ছিল। খড়ের ঘর, খুব বড়ো খড়ের ঘর। সে ঘর আমি দেখেছি। সেই বিল্ডিংটা ছিল গুলাপ রঙের, চারকোনা, কোনো নকশা ছিল না। আটচল্লিশ সনের কালবোশেখিতে বজ্রপাত হল, সেই বজ্রপাতে ওই বিল্ডিংয়ের দক্ষিণ সাইড ভেঙে পড়ে গেল। আমার স্মরণের কারণ হচ্ছে, সাতচল্লিশ সালে পাকিস্তান হল। তার একবছর পরে ১৯৪৮ সালের ঘটনা এটা। আর আমার যে দাদি গুরুমা, সাঁইজির উফতের পরে তিনি ওই খড়ের ঘরে বসবাস করতেন। তাঁর বয়স ১০১ হয়েছিল, ওই বজ্রপাতের শব্দে আমার দাদি গুরুমা দেহত্যাগ করলেন। তিনি তো পেয়ারেমিসা, সাঁইজির পালিতা কন্যা। পেয়ারেমিসার বাবা তাঁকে নিয়ে এসে সাঁইজিকে দান করেছিলেন। তাঁর বাবার নাম হল গুরু শাহ। গুরু শাহের স্ত্রী-র মৃত্যু হলে সে সাঁইজির কাছে এসে বলল – ‘বাবা, এই মেয়ে নিয়ে আমি কোথায় কাজে যাব। আমার পক্ষে তো খুব কষ্ট হচ্ছে।’ তখন সাঁইজি বললেন-- ‘তোমার কষ্ট হচ্ছে তো তোমার গুরুমাকে দিয়ে যাও’। আর বিশাখা ফকিরানিকে বললেন – ‘এই কন্যাটা আজ থেকে তোমার।’ বিশাখা আর মোতিজান, দুজনেই পেয়ারেমিসাকে প্রতিপালন করেন। এদিকে ভোলাই শাহ, সেও ছিল সাঁইজির পালিত পুত্র। তাঁর বাবার নাম ছিল ভাদু শাহ (ভালো নাম বাহাদুর শাহ), বাড়ি হল উদিবাড়ি, মজমপুর। আমার কাছে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই দাখিলা আছে, এইজন্য আমি বলতে পারি এইসব। ভোলাই শাহের মা মারা গেলে তাঁকে ভাদু শাহ সাঁইজির কাছে দান করেন। ভোলাই শাহ আর পেয়ারেমিসা, এঁরা মলম শাহ আর মোতিজানকে দাদা-দাদি বলত এবং তাঁদের ঘরেই থাকত। বয়সপ্রাপ্ত হলে তখন দুজনের বিবাহ দিয়ে দেন সাঁইজি। তাতে সবাই খুশি হয়েছিল। আমি তো আর দেখি নাই, শুনেছি যা তাই বলছি।

প্রশ্ন : মলম শাহের কথা যখন উঠল, তখন একটা প্রশ্ন করি। আমরা লালনের প্রথম জীবনীকার বসন্তকুমার পালের রচনায় পাই লালন হিন্দুঘরের সন্তান। তীর্থকালে বসন্ত রোগাগ্রাস্ত হয়ে পথে পরিত্যক্ত হন এবং প্রাণ ফিরে পান আশ্রয়দাতা মুসলমানের ঘরে ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার আনোয়ারুল করিমের লেখায় পাচ্ছি লালনের বাড়ি হরিশপুরে, তিনি জন্মসূত্রে ছিলেন মুসলমান। কোনটা ঠিক?

উত্তর : (হাসি) এসব প্রতারণা চলছে। স্বয়ং সাঁইজি যখন সত্য বলে যাননি তখন আমরা কিছু খুঁজে পাচ্ছি না। সাঁইজি বলেছেন –

যার মর্ম সে যদি না কয়
কার সাধ্য কে জানিতে পায়
তাই তো আমার দীন দয়াময় মানুষরূপেই ঘোরোফেরে।

প্রশ্ন : অর্থাৎ লালন নিজের পূর্বপরিচয় নিজেই গোপন রাখলেন। কিন্তু সিরাজ সাঁই?

উত্তর : সিরাজ সাঁই সম্বন্ধে তো সাঁইজি কিছু বলেন নাই যে তিনি তাঁর গুরু, তাঁর অমুক জায়গায় বাড়ি...

প্রশ্ন : বলা হচ্ছে যে, তিনি হরিশপুরের একজন পালকিবাহক ছিলেন।

উত্তর : এ সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন। আমি তো সেই হরিশপুর চিনি। আমাদের এই মাজারের থেকে বিশ মাইলের বেশি নয়কো হরিশপুর। সেখানে আমি অনেকবার গিয়েছি। খোন্দকার রিয়াজুল হক (পাঞ্জু শাহের বংশধর) আমাকে দাওয়াত করেছেন। তাঁর দাওয়াতে আমি গেছি, ওখানকার ওই অনুষ্ঠানের দাওয়াতে। অতএব সেই পালকিবাহক যে সিরাজ সাঁই একথাও সত্য নয়, আর লালন সাঁইয়ের বাড়ি যে সেখানে .. বাবার নাম দরিবুল্লা, মায়ের নাম আমিনা খাতুন ... দশকাঠা জমির উপর তাঁদের বাড়ি ... তাও নয়। দেওয়ানবাড়ি

কোনোদিন দশকাঠা জমির উপর হয় না, অন্তত বিশবিঘা জমির উপর হয়। সাধারণ জ্ঞানের কথা, যেটা সত্য সেটা আমি বলছি। সাঁইজির চেহারায় মনে হয় না যে, সে আমাদের বাংলার মানুষ। কিন্তু এটা ... তাঁকে যে এখানে পাওয়া গেল ... সে যদি জীবিত থাকত, তাহলে তো পানির ভিতর ফেলে দিলে সে ডুবে যেত। জীবিত মানুষ পানির ভিতর ফেলে দিলে ডুবে যায় ... কিন্তু মৃত্যুর পর ভাসে। অনেকেই এই কথা নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। অনেকেই ... আনোয়ারুল করিমও করেছেন, ড. আবুল আহসান চৌধুরীও করেছেন। তিনিও বলেছেন ঠিকই তো। এ ধ্যানধারণা তো অনেকেরই নাই।

প্রশ্ন : আপনি সম্প্রতি বলেছেন সিরাজ সাঁই এক কাল্পনিক চরিত্র। সিরাজ আসলে আল্লার ৯৯টি নামের একটা। এই বিষয়ে কিছু বলবেন?

উত্তর : সিরাজ বলতে যে কে, একথা লালন যখন বলেন নাই, আমি তো অনুমানে বলতে পারি না। কিন্তু আল্লার ৯৯টা গুণবাচক নামের মধ্যে যেমন 'এলাহি' আছে, 'আল-আমিন' আছে, 'রহিম', 'করিম' আছে, তেমনই 'সিরাজ'-ও আছে। কিন্তু সেই সিরাজ কি আলাদা সিরাজ আমি যখন জানি না তখন তো আমি সঠিক বলতে পারব না। কিন্তু এটা আমার ধারণা যে, লালন যে ধর্মটা প্রতিষ্ঠিত করলেন, গুরুবাদী মানবধর্ম, গুরুবাদী বলেই 'সিরাজ' শব্দটা ব্যবহার করেছেন গানের শেষে—

দেখ না মন ঝাকমারি এই দুনিয়াদারি।
পরিয়ে কোপনি ধ্বজা মজা উড়ালো ফকিরি।
বড়ো আশার বাসা এ ঘর
পড়ে রবে কোথা রে কার
ঠিক নাই তারি
সাথে সাথে ঘুরছে শমন

কোন সময় যেন হাতে দেয় দড়ি।
দরদের ভাই বন্ধুজনা
মলে কেউ সঙ্গে যাবে না
মন তোমারই
খালি হাতে একা পথে
বিদায় করে দেবে তোরি।
যা কর তাই কর রে মন
পিছের কথা রেখ স্মরণ
বরাবরই
দরবেশ সিরাজ সাঁই কয় শোন রে লালন
হোস নে কারো ইস্তেজারি।

লালনের সংগীতে এমন বহু জায়গায় সিরাজের কথা উল্লেখ করেছেন। তা আমরা সাধারণ মানুষ ধরে নিতে পারি গুরুর নাম হবে হয় তো। আর যদি ওই আল্লার ৯৯টা গুণবাচক নামের মধ্যে হয় তো সেও... 'সিরাজ' মানে জ্যোতির্ময়, 'সাঁই' মানে আল্লা। আর লালন যে ধর্মীয় মহাপুরুষ, সেটা তো আমার মনেপ্রাণের বিশ্বাস, এতে কোনো সন্দেহ নেই। অল্লাদাশংকর রায়ের মতে তিনি জীবনের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেছেন। পড়ালেখা না করেও এই সমস্ত তত্ত্ব আর বাংলার সঙ্গে আরবির এত সংযোগ, সঙ্গতি রেখেছেন যে চিন্তাই করা যায় না। কোনো আলেমও তো আজ পর্যন্ত তার সংশোধন করতে পারল না। যেমন লালন বললেন—

সহজ মানুষ ভজে দেখনা রে মন দিব্যজ্ঞানে
পাবি রে অমূল্যনিধি বর্তমানে।
ভজ মানুষের চরণদুটি
নিত্যবস্ত্র পাবি খাঁটি
মরিলে সকল মাটি
তুরায় এই ভেদ লও জেনে।
মলে পাব বেহেস্তখানা

তা শুনে তো মন মানে না
বাঁকির লোভে নগদ পাওনা
কে ছাড়ে এই ভুবনে।
আস্‌সালাতুল মেরাজুল মোমেনিনা
জান গে সেই নামাজের বেনা
বিশ্বাসীদের দেখাশুনা
লালন কয় এই জীবনে।

দ্যাখেন, বাংলার সঙ্গে আরবির যেভাবে সংযোগসাধন
করেছেন এটা ... এটা কি সাধারণ মানুষের ব্যাপার ?

... আস্‌সালাতুল মেরাজুল মোমেনিনা
জান গে সেই নামাজের বেনা
বিশ্বাসীদের দেখাশুনা
লালন কয় এই জীবনে ...

তাহলে কোরাণ সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ জ্ঞাত। কিন্তু সে তো
পড়ালেখাই করেন নাই, তাহলে সে জানল কী করে? আর
কোরাণের কোথায় কী আছে না-আছে সম্পূর্ণরূপে এই
বিস্তারিত বিবরণ যে দিয়েছেন, আমি তো মনে করি সে ধর্মীয়
মহাপুরুষ, মহান প্রভুর প্রেরিত দূত হয়ে তিনি এসেছিলেন।

প্রশ্ন : interesting ... একটু বিশদে বলবেন?

উত্তর : হিন্দু সনাতনের দিক থেকে আলাপ করতে গেলে মনে হচ্ছে
যেন ইনি স্বয়ং সনাতনের একজন বড়ো পণ্ডিত। আবার
সুফিবাদের আলাপ-আলোচনা করতে গেলে দেখা যাচ্ছে ইনি
সুফিবাদের একজন সাধক। সার্বিক বিষয়ে উনি গুণে গুণাবিত।
এতই পাণ্ডিত্য তাঁর ছিল যে, কোনোদিক থেকেই তাঁকে কমতি
পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা সাধারণ মানুষ। আমরা আত্মার
মুক্তির জন্য তাঁর চরণধূলির আশা রাখি – এই পর্যন্ত। তিনি
তো নিজেই বলেছেন—

এসো দয়াল, পার কর এই ভবের ঘাটে
ভবনদীর তুফান দেখে ভয়ে প্রাণ কেঁদে ওঠে।
পাপ ও পুণ্য যতই করি
ভরসা কেবল তোমারি
তুমি যার হও কাণ্ডারি
ভব ভয় তার যায় ছুটে।
সাধনার বল যাদের ছিল
তারাই কুল-কিনারা পেল
আমার দিন অকাজে গেল
কী জানি হয় ললাটে।
পুরাণে শুনেছি খবর
পতিতপাবন নামটি তোমার
লালন কয় আমি পামর
তাইতে দোহাই দেই বটে।

সে নিজেই পামর নিজে স্বীকার করেছেন। তাই বলে কি
আমরা তাঁকে পামর বলতে পারি? যেমন তাঁর একটা
বাণীতে বললেন—

সত্য বল সুপথে চল ওরে আমার মন
সত্য সুপথ না চিনিলে পাবি নে মানুষের দরশন।
ফড়িয়া মহাজন যারা
তাদের বাটখারাতে কম
কসুর করবে যম
গদিয়ান মহাজন যে-জন
বসে কেনে প্রেম রতন।
পরের দ্রব্য পরের নারী হরণ করিয়ো না
পারে যেতে পারবে না
যতবার করবে হরণ
ততবার হইবে মরণ।
লালন কি আসলে মিথ্যে
ঘুরে বেড়ায় তীর্থে তীর্থে

সই হল না একমন দিতে
আসলে হইল না করম।

কিন্তু অনেক শিল্পী গান করছে, গানে বলছে যে, লালন ফকির আসলে মিথ্যে ঘুরে বেড়ায় তীর্থে তীর্থে। একজন প্রোফেসর, সে ছাত্রদের পড়াতে গিয়ে বলছে -- ‘আমি কি কিছু জানি না?’ ... এ শব্দের অর্থও হচ্ছে তাই যে – ‘লালন কি আসলে মিথ্যে ঘুরে বেড়ায় তীর্থে তীর্থে’। লালন কাশীতে গিয়ে মোষবলিও দেয় নাই, পাঁঠাবলিও দেয় নাই। মন্ডায় গিয়ে উটহত্যাও করে নাই, দুম্বাহত্যাও করে নাই। কোনো ধর্মস্থানে গিয়ে সে জীবহত্যা করে নাই। তাই বললেন যে, ‘লালন কি আসলে মিথ্যে ঘুরে বেড়ায় তীর্থে তীর্থে’। তীর্থে কারা বেড়াচ্ছে? আমরা, আমাদের মুক্তির জন্য বেড়াচ্ছি। তীর্থে তীর্থে ঘুরে অর্থব্যয় করছি, সেখানে জীবহত্যা করছি। সেকথাও সাঁইজি বললেন – ‘পশুবধ করলে কি খোদা খুশি হন? কক্ষনো না। আমার জানের বিনিময়ে একটা পাঁঠা মানত করলাম কী একটা খাসি কুরবান করলাম। তাতে কি আমার আত্মার মুক্তি হবে? তারও তো বাঁচবার অধিকার আছে, তাকে হত্যা করার অধিকার আমার নাই’।

প্রশ্ন : লালন তো মাছ খেতে ভালোবাসতেন। অথচ তাঁর গানে বললেন – ‘মীনরূপে সাঁই বিরাজ করে’। মৎসহত্যা কোনো দোষ নেই বলছেন?

উত্তর : যে মাছ নাকি পানির থেকে উঠালেই মৃত্যুবরণ করে, সেই মাছই সাঁইজি খেয়েছেন। তাই বলে মাগুর, কই, বায়েন, এসব জিওল মাছ উনি খাননি। আমার দাদিমার কাছে আমি ছোটবেলায় গুনেছি (আবার স্মৃতিচারণায় চলে গেলেন) ... মলম শাহের ভাই হচ্ছে আলম। মলম, আলম, কলম, কিলাম, তাঁরা চার ভাই। তাঁদের বাবার নাম মুনশি খায়বুল্লা। আলমের ছেলে হচ্ছে ওমর শাহ। ওমর শাহ হচ্ছেন আমার নানির বাবা। মায়ের মামা হচ্ছেন ওমর শাহের ছেলে মহরম।

তখন তো আর মাজারের ওয়াল ছিল না, তখন প্রায়ই যেতাম মায়ের সঙ্গে...

প্রশ্ন : লালনের গানের প্রসঙ্গে আসি। দুই বাংলাতেই যথেষ্ট জনপ্রিয় ওনার গান। কিন্তু দেখা যাচ্ছে গানের কথা পালটে যাচ্ছে প্রায়ই। এটা কেন হয়?

উত্তর : শিল্পীদের কারণে। একদিন ওই মাজারের লাইব্রেরিতে একজন গান গাইলেন, নাম বলাই শাহ। তিনি গানটা গাইলেন—

আপন ঘরের খবর নে না
অনায়াসে দেখতে পাবি কোনখানে তাঁর বারামখানা।
কমল-কোঠা করে বলি
কোন মোকাম তার কোথা গলি
কোন সময় পড়ে ফুলে
মধু খায় সে অলিজন।
সুস্ম জ্ঞান যার ঐক্য মুখ্য
সাধকের উপলক্ষ
অপরূপ তার বৃক্ষ
দেখলে চোখের পাপ থাকে না।
গুপ্ত নদীর সুখ-সরোবর
তিলে তিলে হয় গো সাঁতার
লালন কয় কীর্তিকর্মার
কী কারখানা।

ও বেরিয়ে এলে আমি বললাম যে, গানটা তুমি বললে, কিন্তু ভুল হল। সে বললে, কেমন? আমি বললাম, তুমি গাইলে -- ‘দেখলে চোখের পাপ থাকে না’ ... ও হবে না, হবে --- ‘দেখলে জীবের জ্ঞান থাকে না।’ এ হচ্ছে নারীদেহের যোনির কথা। দেখলে, যারা জীব যারা সাধক নয়, তাঁদের তো জ্ঞান থাকবে না। জ্ঞানের দ্বারাই তো মানুষ পাপ করছে, পুণ্য করছে, জ্ঞানের দ্বারাই সব করছে।

অতএব ওই জায়গাটা হবে —

সুদৃশ্য জ্ঞান যার ঐক্য মুখ্য

সাধকের উপলক্ষ

অপরূপ তার বৃক্ষ

দেখলে জীবের জ্ঞান থাকে না।

এরকম অনেক গানই তো আমি সংশোধন করে দিয়েছি।

প্রশ্ন : সুরেরও তো রকমফের হয়। বীরভূমে বুমুরের সুর,
উত্তরবঙ্গে ভাওয়াইয়া, নদীয়ায় কীর্তনের সুর, আবার
পূব-বাংলায় ভাটিয়ালির প্রভাব দেখা যায় লালনের গানে।
একটা প্রামাণ্য সুর কি থাকা উচিত, আপনার কী মনে হয়?

উত্তর : অবশ্য অবশ্য। পূর্বে তো ছিল। এই আবদুল করিম শাহের
কাছে পুরোনো সুরটা এখনো কিছুটা আছে। করিম শাহ খুবই
অসুস্থ। আর এখানে বজলু শাহের কাছে কিছুটা আছে।
লালনের আদি সুরে দু-একখানা গান ওরা নিশ্চয় দিতে
পারবেন আপনাকে। আপনারা টেপ করে নিতে পারেন।

প্রশ্ন : ওঁরা তো চিরদিন থাকবেন না। স্বরলিপি করে রাখলে কি
ভালো হত না?

উত্তর : সেটা হত। যদি মাজারটা আমাদের হাতে থাকত। মাজারটা
এখন গিয়েছে অ্যাকাডেমির হাতে। অ্যাকাডেমি হচ্ছে
ব্যবসায়ী, তারা ব্যবসা করছে। তারা লালনকে নিয়ে চিন্তা
করছে না, তারা চিন্তা করছে পয়সা নিয়ে। যেমন এই যে
চারকোটি টাকার কাজ হল, তাতে এক বা দেড়কোটি টাকা ব্যয়
হয়েছে। আড়াই কোটি টাকাই ওদের লাভ হল। বছরে ওদের
ইনকাম তো কম নয়। যতগুলো মোবাইল কোম্পানি, কেউ
দিচ্ছে পাঁচলাখ, কেউ দশলাখ, কেউ দিচ্ছে বিশলাখ। এর
কোনো হিসাবনিকাশই নাই। অনুষ্ঠানে খুব বেশি হলে ব্যয় হয়
বিশমণ চাউল কী দুই-তিনমণ ডাউল। অথচ লিখে দেওয়া
হল ১০০ মণ চাউল, ৫০ মণ দই, ১০ মণ মাছ ... একটা

খসড়া হিসাব দেওয়া হল। কিন্তু আসল তো নয়। এছাড়া
স্মরণোৎসব আর তিরোধান দিবস -- এই দুইবারে মাজারের
সিন্দুক থেকেও প্রত্যেকবারে অন্তত পাঁচলাখ টাকা পাওয়া
যায়। তাহলে এই টাকা এরা করেটা কী? কোনো হিসাব নাই।
তার কারণ ওই কার্যকরী পরিষদে যে ষোলোজন না
সতেরোজন আছে তারা সব ... সাঁইজি তো তাঁর গানে
বললেন—

শহরে ষোলোজনা বোম্বেষ্টে
করিয়ে পাগলপারা নিল তারা সব লুটে।
রাজ্যেশ্বর রাজা যিনি
চোরের শিরোমণি
নালিশ করিব আমি
কোনখানে কার নিকটে।
গেল ধন মালখানায়
খালি ঘর দেখি জমায়
লালন বলে খাজনারি দায়
কখন যেন যায় লাটে।
তো এরা সব বোম্বেষ্টে ...

প্রশ্ন : একটু অন্য প্রসঙ্গে আসি। লালনের সময়ে তো প্রায়ই বাউল
ধ্বংসের ফতোয়া জারি করতেন শরিয়তপন্থীরা। আপনারা
এমন কোনো আক্রমণের মুখে পড়েছেন?

উত্তর : ১৯৪২ সালে মৌলানা আফতার সাহেব বাউলদের উপর
নির্যাতন করেছিল। ওই মাজারের উত্তরে, সেখানে একটা যাঁড়
হত্যা করেছিল। তারপর এতদিন পরে আবার হল এই
পানসায়। পানসায় ২৮ জন বাউলের চুল কেটে দিয়েছে,
তাঁদের উপর নির্যাতন হয়েছে। ইন্ডিয়াতেও তো ১১ জায়গায়
মানববন্ধন হয়েছে, প্রতিবাদসভা হয়েছে।

প্রশ্ন : এই সংকটে অ্যাকাডেমিকে পাশে পাননি?

- উত্তর : লালন অ্যাকাডেমি একটা ব্যাসায়িক প্রতিষ্ঠান, তার সঙ্গে প্রকৃত লালন অনুসারীদের কোনো সম্পর্কই নাই। এত বড়ো একটা কাণ্ড ঘটে গেল, কুষ্টিয়ায় আমরা দুইটা মানববন্ধন করলাম, প্রতিবাদসভা করলাম এবং টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচার হল — কিন্তু অ্যাকাডেমি একটা প্রতিবাদও করেনি এপর্যন্ত। তাঁরা তো লালন অনুসারীদের প্রতিদ্বন্দ্বী, পক্ষের লোক না।
- প্রশ্ন : আপনাদের নিজেদের মধ্যে তো এভাবে একটা বিভাজন হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।
- উত্তর : ভাগ তো হয়েই গিয়েছে। যারা পয়সার লোভী, তারা অ্যাকাডেমির পক্ষেই রয়েছে।
- প্রশ্ন : আবার লালনের কথায় ফিরি। আপনার সারাজীবনের যে কাজ অর্থাৎ লালনের গান সংগ্রহ, সেই নিয়ে কিছু বলুন।
- উত্তর : আমার গুরু ওই যে প্রথমেই বললেন লালনের গান সংগ্রহ করতে, সেই গানগুলো বুঝতে — তাহলেই এই সাধনার নিগূঢ় তত্ত্বকথা আমি জানতে পারব ... তখন থেকেই আমি সাঁইজির গান সংগ্রহ করতে শুরু করি। প্রচুর ঘুরতে হয়েছে। পাবনা, রাজশাহী, যশোর, খুলনা, ফরিদপুর যেমন গিয়েছি তেমনই বর্ধমান গিয়েছি, মধুবন গিয়েছি, শক্তিগড় গিয়েছি। ১৯৬০ সালে দীক্ষার পর থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত আটশো গান জোগাড় হল। সাধকদের মুখ থেকে, শিল্পীদের মুখ থেকে এই সমস্ত গান আমি সংগ্রহ করেছি। ১৯৯৩ সালে ৩০০ গান দিয়ে ‘লালন সংগীত’-এর প্রথম খণ্ড আমি প্রকাশ করি। তারপর ১৯৯৫-এ আরও ৩০০ গান দিয়ে দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশ হয়। তারপর এই তৃতীয় সংস্করণে দেওয়া হয়েছে আরও ২৭০টা গান। আরও ৩০টা গান আমার সংগ্রহে আছে, পরে যখন সংস্কার হবে, ওইগুলো দিয়ে ৯০০ পুরা করে দেব। আমি তো পৃথিবীতে থাকব না, সাঁইজির বাণীটা যাতে থাকে সেটা রক্ষার জন্য আমাদের চেষ্টা আছে ও চলছে।

- প্রশ্ন : কাজটা নিঃসন্দেহে কঠিন। কোনটা লালনের গান, কোনটা নয় সেটা নির্ণয় করাটাই তো শক্ত। এখন যেমন গবেষকরা বলছেন, ‘চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে’ বা ‘এমন সমাজ কবে গো সৃজন হবে’ — এই গানদুটো লালনের গান নয়।
- উত্তর : প্রথমটা সাঁইজির গান নয় ঠিকই। কিন্তু দ্বিতীয়টা ওনার গান।
- প্রশ্ন : ওই গানে আছে ‘যেদিন হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান জাতিগোত্র নাহি রবে’। পণ্ডিতরা বলছেন এমন জাতের উল্লেখ লালনের সময় অসম্ভব।
- উত্তর : কেন নয়? তিনি তো বলেছেন —
পাপ-পুণ্যের কথা আমি কারে বা শুধাই
এই দেশে যা পাপ গণ্য অন্য দেশে পুণ্য তাই।
তিব্বত নিয়ম অনুসারে
এক নারী বহু পতি করে
এই দেশেতে হলে পরে
ব্যভিচারী দণ্ড হয়।
শূকর গোরু দুইটি পশু
খাইতে বলেছেন যিশু
তবে কেন মুসলমান হিন্দু
পিছেতে হটায়।
দেশ সমস্যা অনুসারে
ভিন্ন বিধান হতে পারে
সূক্ষ্ম জ্ঞানের বিচার মতে
পাপপুণ্যের নাহি বালাই।
পাপ হলে এই ভবে আসি
পুণ্য হলে স্বর্গবাসী
নামে উর্বশী লালন বলে
তার নিত্য নিত্য প্রমাণ পাই।

এই তো লালন বললেন সমাজের ভিন্ন ভিন্ন জাতের কথা।

কোন গানটা সাঁইজির, কোনটা না সেইটা বোঝার আর একটা উপায় আছে। দেখাচ্ছি, তাহলে বুঝতে পারবেন (উঠে গিয়ে পাশের ঘর থেকে একখণ্ড 'লালন সংগীত' নিয়ে এলেন) ... এই দেখুন লালনের গানের প্রত্যেক কলির শেষে একই অক্ষর হতে হবে। এইটা না থাকলে সে লালনের গান নয়। এইরকম মিল তো আর কেউ দিতে পারে নাই।

প্রশ্ন : এই অন্তিমিল ছাড়া আর কিছু?

উত্তর : লালনের গানের যে গাঁথুনি তা অন্য কোনো গানে নাই। প্রয়াত সাধক মহিন শাহ একবার সাঁইজির ভণিতা দিয়ে একটা গান প্রকাশ করলেন। মাজারের দক্ষিণে একটা আমগাছ ছিল, একদিন বিকেলে সেই গাছটার নীচে মহিন শাহের সঙ্গে দেখা করলাম আমি আর মাজারের তখনকার খাদেম নিলাম। আমরা দুজনে বললাম — 'এই গান তো সাঁইজির না। তাহলে তুমি সাঁইজির নাম দিলে কেন?' উনি বললেন যে বাধা এলে বাদ দেওয়া হবে।

প্রশ্ন : এ তো গেল গান সংগ্রহের পর্ব। তারপর?

উত্তর : আমাদের একটা বোর্ড আছে। সেই বোর্ডে যাচাইবাছাই করেছি। যেমন বোর্ডে করিম শাহ ছিল, প্রয়াত গোলাম ঝাড়ু শাহ ছিল। ভুলত্রুটি থাকলে সংশোধন করে তবে সেই গানটা নেওয়া হয়েছে। পরিশ্রম তো যথেষ্ট হয়েছে, অর্থব্যয়ও হয়েছে। বোর্ডের হয়তো বিশজন, এদেরকে ডাকলে এদের পিছনে তো ব্যয় করতে হয়। যেমন ঝাড়ু শাহ বললেন — 'আপনার ওখানে যে সাতদিন থাকব, সেই সাতদিন আমার আখড়ার খরচ দিতে হবে।' হয়তো সেই সময় সাতশো টাকা দেওয়া হয়েছিল। কোনো সময় বেশি লেগেছে, কোনো সময় কম। আর একজন আমার লিপিকার ছিলেন অমলবাবু, তাঁকেও দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে মৌমাছি যেমন মধু সংগ্রহ করে, আমার এই কাজটাও সেই মধু সংগ্রহের মতোই ... তিলতিল করে এই জায়গায় পৌঁছেছি।

উঠে পড়লাম। আমার প্রশ্ন শেষ, ওনাকে এবার বিশ্রাম দেওয়া দরকার। সকালে শুধুমাত্র চা-বিস্কুট খেয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছেন উনি। কথায় কথায় গড়িয়ে গেছে ঘণ্টা দুই। বেরিয়ে আসার সময় ওনাকে প্রণাম ও ধন্যবাদ জানালাম আমাদের এতখানি সময় দেওয়ার জন্য। দরজায় দাঁড়িয়ে উনি বললেন — 'সময় প্রয়োজন হলে আরও দেব। আমি তো সাঁইজির দাস, আমি আমার গুরু দাস।'

আরও দিতে চেয়েছিলেন ফকির আনোয়ার হোসেন মন্টু শাহ। আমরা নিতে পারলাম না।

বাঁকা নদীর পিছল ঘাটে
ও তুই পারে যাবি কি করে

শব্দ ও শোনা বিষয়ে কিছু ভাবনা

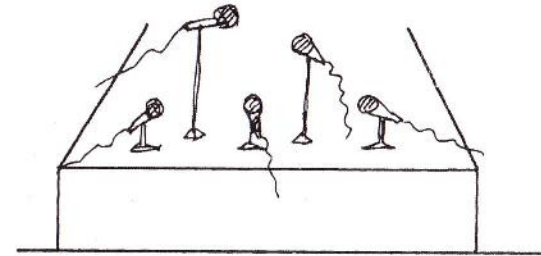
সুকান্ত মজুমদার

"Now I'll do nothing but listen . . ."

(Walt Whitman-এর 'Song of Myself' থেকে। সূত্র: R. Murray Schafer-এর বই *The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the World*)

বাউল ফকির মেলার প্রথম বছর থেকেই গান রেকর্ডিং-এর দায়িত্ব বর্তাল আমার উপর। আমরা সকলেই তখন সব কিছু প্রথমবার করছি, পরের বার আর করতে হবে কিনা, সেটা জানিও না। তারপর মজে গেলাম আরো অনেকের মতই। বাউল ফকির মেলা আমার আর মৌসুমীর গান নিয়ে কাজের একটা অঙ্গই হয়ে গেল আস্তে আস্তে।

এই গান নিয়ে কাজ করতে গিয়ে নানাসময় দেখা হয় শিল্পীদের সঙ্গে, রেকর্ড করি, কথা বলি, পুরনো কোনো জায়গায় ফিরে ফিরে যাই, আরো নতুন মানুষদের সঙ্গে দেখা হয়, কখনো কখনো আবার এক জায়গায় গিয়ে সেখানে আর ফেরা হয় না, তবে অভিজ্ঞতা বাড়ে ধীরে ধীরে। আর প্রশ্ন তৈরি হয় কিছু কিছু। আমার যেহেতু শব্দ আর শোনা নিয়েই কারবার, তাই এসব কথাই আমার লেখার বিষয়।



এই ছবিটা আমাদের চেনা। একটি মঞ্চ, elevated space, যা কুশীলবদের

দর্শকদের চোখে দৃশ্যগতভাবে একটু উঁচুতে তুলে ধরার জন্য নির্মিত। মঞ্চের উপরে কতগুলি যন্ত্র। এইগুলিও আমাদের চেনা। মাইক্রোফোন। দর্শকদের কানে কুশীলবদের আওয়াজ জোরে ও স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেবার জন্য রাখা। এও এক ধরনের elevation-এর আয়োজন।

ধরে নিই, এই মঞ্চটা আমাদের বাউল ফকির উৎসবের মঞ্চ। এই মঞ্চ বা এই ধরনের অন্যান্য জায়গায় যাঁরা নিয়মিত গান শোনেন, তাঁরা মনে করতে পারবেন এইসব স্থানের শব্দ-দৃশ্যের বাতাবরণ (ambience)। গায়কদের পোশাকের চাকচিক্য ও শব্দের ব্যঞ্জনাময় সন্ধ্যাগুলো থেকে একটু পিছিয়ে যদি দিনের অন্যসময়ে নজর ফেরান, দেখবেন এই মানুষগুলিই শক্তিগড়ের মাঠে, শীতের রোদ গায়ে, বিড়ি হাতে গালগল্ল করছেন, গান-বাজনাও হচ্ছে। গোল হয়ে বসে, ঘরের মধ্যে বা মেলার প্যাভেলের ভিতর। অনেকেই শুনছেন, যাঁরা গাইছেন তাঁরাও মশগুল। এই দেখা-শোনায়ে যে কোনো 'elevation'-এর প্রয়োজন হচ্ছে না, তার ব্যাখ্যা এই ঘটনার সময়, লোকসংখ্যা ইত্যাদি নানা কারণের মধ্যে নিহিত। আমি সেদিকে যাচ্ছি না। আবার সন্ধ্যায় এই দেখা-শোনাটাই অন্যরকম অভিজ্ঞতায় পর্যবসিত হচ্ছে কেন, সেই প্রশ্নের দিকেও আমি ঘেঁষব না। এইবার এই গোটা ঘটনাটার দৃশ্যরূপটাও মন থেকে মুছে ফেলি যদি, পড়ে থাকে শুধু শব্দ।

কান এমন একটা যন্ত্র যে বেচারার মাতৃ-জঠরে গঠন ইস্তক মৃত্যু পর্যন্ত কোনো বিশ্রাম থাকে না। চোখের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আদৌ এমন নয়। তবু মনে হয় যেন এই জগৎ সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা প্রধানত চাক্ষিক।

গাড়ির হর্ন শুনে রাস্তার পাশে সরছি, পৌরসভার ময়লা ফেলার গাড়ি এলে বাঁশি শুনে ময়লা ফেলতে যাচ্ছি, ঘড়ি বা মোবাইলে অ্যালার্ম দিচ্ছি সময়মত ওঠার জন্য-এমন আরো কত কি। খেয়াল করুন, চোখের উপর আলো ফেলে ঘুম ভাঙাবার ব্যবস্থার থেকে আওয়াজ করে ঘুম ভাঙাবার প্রথাই কিন্তু স্বীকৃত। কান যন্ত্রটা অবিরত কাজ করে চলেছে বলেই এই ব্যবস্থা মনে হয়। এই মুহূর্তে এই লেখাটা পড়া একটু স্থগিত রেখে মনটাকে যদি শোনা এবং শুধুমাত্র শোনাতেই নিবেশ করতে চান, যথেষ্ট বেগ পেতে হতে পারে। এমনকি মন ব্যাটাকে বাগে আনতে চোখদুটিকে শক্ত করে চেপে বন্ধ করে, তবে শুনতে হতে পারে।

আবার মেলার গল্পে ফিরি। আলোচ্য বিষয় আমরা ছোট করে শব্দের গণ্ডিতে বেঁধে রেখেছিলাম। এখন মেলার শোনাটাকে একটু বোঝার চেষ্টা করা যাক। এই মেলার শোনা বলতেও আমি শুধু গান শোনার মধ্যেই থাকতে চাইছি। গান শোনার বিষয়টাকে আমরা একটু ভেঙে দেখি।

১। Live concert শোনা। যে শোনাটাকে আমি elevated বলছিলাম লেখার শুরুতে। চোখের সামনে যা ঘটছে তারই একটা বর্ধিত (amplified) আর balanced রূপ দর্শক শুনছেন। শব্দের এই চেহারাটা যিনি তৈরি করছেন তিনি শব্দযন্ত্রী। এখানে শব্দযন্ত্রীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আরো একটা কারণে। তিনি যা শোনাতে চাইছেন, অথবা বলা যায় যে তাঁর নিজের কানে যা ঠিক লাগছে, শ্রোতা সেইরকমই শুনছেন (ব্যাপারটা আসলে এতখানিই ব্যক্তিগত, ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপই বলা চলে!)।

যাই হোক, এইভাবে শোনার ইতিহাসও পুরনো। তাই এই শব্দের একটা গঠনবিন্যাস (texture) আমাদের কানে ধরা রয়েছে। শুনলেই আমরা বুঝে নিতে পারছি এই আওয়াজ কোথা থেকে আসছে। একটু তীক্ষ্ণ, তীব্র, আর নিচু কম্পাঙ্কের শব্দের বুক ধাক্কা মারা গুমগুম-বেশ জানান দেয় প্যাভেল আশেপাশেই। ভিতরে অনেককেই দেখা যায় চোখ বুজে, মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে, হাঁটুতে তাল ঠুকে ঠুকে গান শুনছেন। শোনাটা যে খুবই উপভোগ করছেন, শুধু তাই নয়; আশেপাশের কথাবার্তা, হৈ-হট্টগোল তার খুব একটা ব্যাঘাত ঘটাতেও পারছে না।

২। এইবার আমাদের এই শ্রোতাকে একটু follow করা যাক। গান-টান শুনে, মেলা প্রাঙ্গণেই এটা-ওটা খেয়ে পেট ভরিয়ে, প্রফুল্ল চিত্তে মেলা-কমিটির দোকান থেকে উৎসবের গানের একটা সিডি কিনে এই নিয়মিত শ্রোতা গভীর রাতে বাড়ি ফিরছেন। দিন কয়েক পরে অফিস থেকে ফিরে গান শোনার যন্ত্রে চালিয়ে দিচ্ছেন সদ্য কেনা অ্যালবামটি। এইবারে কেমন হচ্ছে তাঁর শোনাটা? এই গানগুলিই গত বছর তিনি শুনেছেন শিল্পীদের সামনে বসে, সে স্মৃতি এমন কিছু ধূসরও হয়নি। গত বছর শোনা প্রিয় গানটি বেছে নিয়ে ওটাই চালিয়ে দিচ্ছেন প্রথমে। এবারে গান আর বাদ্যযন্ত্র ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। তাঁর পাশে বসে যে মানুষটি প্রবল বাহবা দিয়েছিলেন তাঁর গলারও কোনো আওয়াজ নেই। মাঝে মাঝে ক্ষীণ উল্লাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে হয়ত, আর শোনা যাচ্ছে

গান শেষে হেঁই-হাততালি। বাকি সময়টা মনে হচ্ছে শিল্পীরা সামনেই বাজাচ্ছেন, তাঁদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, নাচের সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের কাঠের তক্তার ধূপধাপ—perspective-টা বদলে গিয়ে শিল্পীরা সামনে এসে সহ-শ্রোতার পিছনে চলে গেছেন। যদিও আবার এই শব্দও পরিকল্পিত, যিনি গানগুলি mix করেছেন তাঁর শিক্ষা, রুচি, শোনার অভিজ্ঞতার দ্বারা processed। আরো একটা ব্যাপার ঘটছে এই ক্ষেত্রে। শ্রোতার অজান্তেই (অনেক সময় অনিচ্ছাতেও) তিনি যেখানে বসে শুনছেন, সেই ঘরের পারিপার্শ্বিকের একটা ভূমিকা থেকে যাচ্ছে। তাঁর শোনার মধ্যেই বাইরের রাস্তায় হযত প্রতিবেশীর গাড়ি এসে থামছে, বাজনা বাজিয়ে ব্যাক করছে। পাশের বাড়ির টিভি থেকে জনপ্রিয় সিরিয়ালের চরিত্রদের প্রচণ্ড টেল্ড গলা, রোমাঞ্চকর মিউজিকের মধ্য থেকে ছিটকে আসছে, আর বাড়ির রান্নাঘরে ফ্যাস ফ্যাস করছে প্রেশার কুকার। এই এতকিছু এবং আরো অনেক কিছুর মধ্যে বসে শোনার ফলে গানের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে এমন অনেক কিছু যা তিনি সবসময় মনোযোগের ছাঁকনিতে ছেঁকে নিতে পারছেন না।

আরো একটা অমোঘ ঘটনা ঘটছে। যাকে আমরা ধ্বনিবিজ্ঞানের পরিভাষায় বলি ‘adding the room’, অর্থাৎ যে ঘরে বসে শুনছেন, সেই ঘরের যা ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য, তা যুক্ত হয়ে যাচ্ছে তাঁর প্রিয় গানের সঙ্গে। ছোট্ট উদাহরণ দিলে বিষয়টা আর একটু পরিষ্কার হয়ে যাবে। খালি ঘরে বা বাথরুমে যেমন কোনো শব্দ করলে গমগম করে, সেইরকম যে কোনো ঘরেরই একটা শাব্দিক চরিত্র আছে। শব্দ সেই ঘরের দেয়ালে, আসবাবে, আরো হরেক জিনিসে ধাক্কা খেয়ে এমন একটা চেহারা নেয়, যা সেই ঘরের ক্ষেত্রেই সম্ভব, একই শব্দ অন্য ঘরে হযত শুনতে একটু অন্যরকম। যেমন, আপনি বসার ঘরে বসে গান গাইলে কেমন যেন বেসুরো, আর সেই গানই যখন চান করতে করতে বাথরুমে গাইছেন, এমন চমৎকার গমগমে গলা, নিজেই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছেন।

৩। এইখানে আবার মেলা প্রাপ্তি ফেরা যাক, সকালের দিকে যখন মাইক ছাড়াই, নিচে গোল হয়ে বসে গান-বাজনা হচ্ছে। শ্রোতারাও আশেপাশেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে। এই শোনাটা লক্ষ করলে দেখা যাচ্ছে শ্রোতা ও গাইয়ে-বাজিয়েদের মধ্যে কোনো তৃতীয় ব্যক্তির হস্তক্ষেপ নেই। গায়করা নিজেদের মত গাইছেন, গলা কখনো কখনো চাপাও পড়ে যাচ্ছে উচ্চকিত বাদ্যযন্ত্রের আড়ালে, আবার ভেসে উঠছে, বাইরের শব্দও অল্পবিস্তর আসছে

ভিতরে। সব মিলিয়ে একটা পরিমণ্ডল গঠিত হচ্ছে, যেখানে শ্রোতা ও শিল্পী কারোর উপরেই শব্দযন্ত্র/যন্ত্রীদের কোনো প্রভাব নেই।

এখন এই ঘটনাটা যদি শব্দবদ্ধ করা হয় এবং পরে কোন সময় শোনা হয়, দেখা যাবে এই শব্দের texture-এর সঙ্গে আগে উল্লিখিত রেকর্ডিং-এর এর কোনো মিল নেই। কারণ এখানে গাওয়ার সময় তা বাড়িয়ে (amplify করে) আরো নানা এফেক্ট সহ শোনানো হচ্ছিল না। সুতরাং সেই আবহের কোনো প্রভাব এর মধ্যে নেই। আর শ্রোতা ও শিল্পী সকলেই যেহেতু একই জায়গায় রয়েছেন, তাই এই রেকর্ডিং-এ শ্রোতাদের উপস্থিতিও হযত ভালমতোই টের পাওয়া যাবে। হযত একটা ক্যামেরার শাটার টেপার শব্দ, বা কারো মোবাইলে মেসেজ এলো, কেউ হযত চাপা গলায় কথা বলছেন, একটা মোটরবাইক চলে গেল পাশের রাস্তা দিয়ে—এই সবই শোনা যাচ্ছে এই রেকর্ডিং-এ। এই রেকর্ডিংটা তখন আর শুধুমাত্র শিল্পীদের অনুষ্ঠানের শব্দবদ্ধ-রূপ থাকছে না, বরং রেকর্ডিং-স্পেসের সেই সময়কার ambience-এর একটা চেহারা এখানে ফুটে উঠছে। শব্দযন্ত্রীর ভূমিকা এখানেও খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তিনিই পরিকল্পনা করছেন কীভাবে ধরে রাখবেন এই ঘটনাটা, গানকে প্রাধান্য দিয়ে, নাকি ambient sound প্রধান হবে এখানে, গান হবে তারই একটা অংশ। রেকর্ডিং-এ দুই ধরনের perspective-ই তৈরি করা সম্ভব এবং রেকর্ডেড শব্দ হিসেবে দুটোরই গুরুত্ব অপরিসীম।

পারিপার্শ্বিক-প্রধান শব্দের আলোচনায় না গিয়ে বরং নজর দেওয়া যাক গান-প্রধান রেকর্ডিংটার দিকে। এতে গায়কদের গলা স্পষ্ট, সহ-শিল্পীদের বাজনাও স্পষ্ট, যদিও পারিপার্শ্বিকের একটা ছাপ এতে থেকেই যায়। এই আপাত অপ্রয়োজনীয় শব্দগুলির একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে, কারণ তা রেকর্ডিং-এর স্থান ও সময় সম্পর্কে একটা আন্দাজ দেয়। আজ থেকে ৬০-৭০ বছর আগে কেঁদুলি মেলা কেমন শুনতে ছিল, তা হযত কিছু প্রাচীন মানুষের স্মৃতিতে থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের সেসব শোনার কোন উপায়ই মনে হয় নেই (এখনো পর্যন্ত যতটুকু জানি)। এই দ্রুত-পরিবর্তন (নাকি উন্নয়নশীল দেশে শক্তিগড় মাঠের আশেপাশের চেহারা আজ থেকে ৫০ বছর পর কেমন হবে, তা অনুমান করাও শক্ত। তাই এই শব্দগুলি না হয় থাকলই, এই সময়ের চিহ্ন হিসেবে।

গানের উপস্থাপনার ধরন কেমন হবে তার একটা প্রচলিত রূপ আছে। “পরিচ্ছন্ন” রেকর্ডিং, তাল-লয়-সুর সব ঠিকঠাক, কথা ভুল হয়ে যাচ্ছে না, গায়ক গানের মধ্যে কেশে ফেলেননি বা গলা খাঁকারি দেননি, আর গান নির্বিশেষে সকলের গলাই যে উদাত্ত ও গমগমে সে তো বলাই বাহুল্য। মাপ মতো নানা যন্ত্র মাঝে মাঝেই বেজে উঠে গানকে “অলঙ্কৃত”ও করছে। এই রূপটি আমাদের ভিতরে এমন জবরদস্ত গেঁথে বসে আছে যে, অনেকেই রেকর্ডিং “পরিচ্ছন্ন” না হলে রীতিমত বিরক্ত হন। এমনকি শিল্পীরা, যাঁরা নিজেরাই এই গানের স্রষ্টা, তাঁরাও নিজেদের সৃষ্টিকে এই বিশেষ আবরণে না মুড়লে যেন চিনতেই পারেন না, বা বলা ভাল, মেনে নেন না। যে গান প্রিয় শ্রোতাদের সামনে নিঃসঙ্কোচে গাইছেন, সে গানই রেকর্ড হলে তা “আরো ভাল” (enhanced) করে তবে শ্রোতাদের কাছে পৌঁছানোর এই মনোভাবের পিছনে নানা কারণ খোঁজা যায়। একটি তো অবশ্যই দৃশ্যগত দিকটা বাদ যাওয়া। সামনে বসে গাইলে শ্রোতা শুধু শুনছেন না, গায়ককে দেখছেনও। এই shared experience-টাই একটা focussed experience-এ পরিণত হলে হয়ত দেখা যাচ্ছে “ভুল ত্রুটিগুলো” বেশি করে নজরে পড়ছে। গলাটাকে একটু “ভাসিয়ে” (reverb দিয়ে) না দিলে কানে কেমন যেন শুকনো, বেসুরো ঠেকছে। রেকর্ডেড শব্দের স্থায়িত্বও নিশ্চয় আর একটা কারণ। শব্দবদ্ধ হওয়া মাত্র মাঠে গাওয়া গান তাৎক্ষণিকতা-মুক্ত হয়ে অমর হয়ে যাচ্ছে। অমরত্ব তো আর সোজা কথা নয়, তার কিছু দাবি থাকবেই।

অমরত্বের অবশ্য একটি অন্য দিকও আছে। এই সময়ের শব্দের দলিল হিসেবে যে রেকর্ডিং এতটা জরুরি, তাকে process করে, তার যাবতীয় “ত্রুটি” বাদ দিয়ে প্রকাশ করা কতটা ঠিক?

বিভিন্ন সময়ে এই অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে, যেখানে গায়ক তাঁর গানের রেকর্ডিং শুনে খুশি হননি। আপত্তিটা প্রধানত নিজেদের গলা নিয়ে। কেন এত শুকনো লাগছে শুনতে, এই নিয়ে প্রশ্ন শুনি মাঝে মাঝে। মঞ্চের অনুষ্ঠানের সময় তো দেখা যায় বিশেষ বিশেষ শ্রোতা আমাদের এসে বলছেন, গলায় বড্ড বেশি reverb, একটু কমাও, আবার পরক্ষণেই গায়ক হয়ত বলছেন গলায় আর একটু reverb দাও, বাঁশিটা আরো একটু ভাসিয়ে দাও, ইত্যাদি। মানে, শোনার মধ্যে শুধু এক ধরনের সংস্কার কাজ করে তাই নয়, বিষয়টা নিয়ে আমরা রীতিমত খুঁতখুঁতে।

মাঠে-করা রেকর্ডিং process করার কিছু কিছু মুশকিলের দিক আছে।

স্টুডিওতে রেকর্ড করা একটা গানের বিভিন্ন element আলাদা আলাদা করে রেকর্ড হয় বলে, একটা বিশেষ element আলাদা করে process করা সুবিধা। তার প্রভাব অন্যদের উপর পড়ে না। কিন্তু এই মাঠের গানে নানা শব্দ মিশে যে জিনিসটা শোনা যাচ্ছে, সেখানে একটা বিশেষ শব্দের দিকে নজর দেওয়া শুধু কঠিন নয়, বিপজ্জনক। কারণ তার প্রভাব অন্য শব্দের উপর পড়ে এবং তখন সুর-তাল-লয়ের “ভুল”গুলো (যদি থাকে), আরো প্রকট হয়ে পড়ে। যদি “ভুল” নাও থাকে, তাহলেও একে অন্যকে ছাপিয়ে ওঠার প্রতিযোগিতায় গোটা ঘটনাটার সুরটি কোথাও যেন টাল খায় বলে মনে হয়।

তাহলে রেকর্ডিং শুধু স্টুডিওতে করলেই তো হয়। কিন্তু সেখানেও কিছু সমস্যা আছে। একটা বড় সমস্যা হল, মেলায় যাঁরা আসেন, স্টুডিওর পরিবেশে গান গেয়ে অনেক সময়েই তাঁরা যথেষ্ট আরাম পান না। আর এটা শুধুমাত্র আনকোরা শিল্পীদের ক্ষেত্রে ঘটে এমন নয়, যথেষ্ট অভিজ্ঞ শিল্পীদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়েও আমাদের অনেক সময় একইরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে। যন্ত্রশিল্পীরাও একটা একটা করে যন্ত্র বাজিয়ে, track তৈরি করে, সেটা শুনে, একটা নতুন track-এ আর একটা যন্ত্র বাজানোর যে প্রথা, তাতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন না। কারণ লয়ের হেরফের এই ধরনের গানের একটা অঙ্গ। এবং লয়ের এই বাড়ী-কমা ব্যাপারটা একেবারেই তাৎক্ষণিক। সেই সময়, সেই পরিবেশ ও শিল্পীদের মানসিক অবস্থার (mood) প্রতিফলন সরাসরি গানের উপর পড়ে। ফলে একই গান, এক এক সময়, এক এক শিল্পীর হাতে এক এক রকম হয়ে ওঠে, এবং এর কোনো নির্দিষ্ট ব্যাকরণ নেই। তাই একে স্টুডিওতে পুরে ছাঁচে ফেলতে গেলেই নানা অসুবিধা। যে গানের কোনো সর্বজন-স্বীকৃত স্বরলিপি নেই, কথার সামান্য এদিক-ওদিকও মেনে নেওয়া হয়, তাল-লয়ের হেরফের বেঁধে দেওয়া নেই, সেই গানের সৌন্দর্য তো আসলে এই না-থাকাগুলো নিয়েই। অথচ অনেক সময় শিল্পী নিজেই এই না-থাকাগুলোকে যেন একটা খামতি মনে করেন। শব্দের একজন কারবারি হিসেবে এখানে আমার অসহায় লাগে।

গায়ন পদ্ধতি, গানের বাণী ইত্যাদি বিষয়ে ওজর-আপত্তি তোলা ও একটি নির্দিষ্ট ধরনের গায়ন ও বাণীর মালিকানা কায়ম করার যে রাজনৈতিক দিক, সেটা এই আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিক। আমি শুধু আমাদের প্রাত্যহিক শোনার অভ্যেসের দিকটাই বলতে চাইছি। মনে রাখতে হবে, একটা গান রেকর্ডিং হয়ে

যাওয়া মানে কিন্তু সেই গানের শিল্পীও শ্রোতা হয়ে গেলেন। তখন তাঁর শিল্পী-সত্তার থেকেও শ্রোতা-সত্তা বেশি প্রবল হয়ে উঠবে। এবং মানুষের শোনা ভীষণভাবে তার বড় হওয়া, শিক্ষা, পরিবেশ ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত। শোনার অভিজ্ঞতা আমাদের এতই স্বাভাবিক যে তার দিকে আর আলাদা করে নজর দেওয়া হয় না। কিন্তু শোনারও নানা দিক রয়েছে। Conscious এবং informed listening, অর্থাৎ জেনে-বুঝে মন দিয়ে শোনা আসলেই চর্চা করতে হয়।

লিখতে লিখতে মনে হচ্ছিল কিছু রেকর্ডিং শোনাতে পারলে ভাল হতো। তাই একটা লিঙ্ক দিচ্ছি।

<http://dl.dropbox.com/u/36100198/soundtracks.zip>

ডাউনলোড করলে তিনটে ছোট ছোট soundtrack পাওয়া যাবে।

সবগুলোই field recording, এইটুকুই বলা থাক।

প্রেম জানে না হাট কানা
তার সঙ্গে কী লেনাদেনা
ভেক জানে কি পদ্মের মধু
জলে ভাসে ডোবে আর তোলে পানা

রমণী রমণ আগে কর সাধন বলে গেছে তত্ত্বজ্ঞানী

হাসন রাজা, তাঁর গানের তরী

মৃদুল কুমার চক্রবর্তী

সুরমা নদীর তীরে ছোট্ট একটি গ্রাম লক্ষণশ্রী। আঞ্চলিক উচ্চারণে যার নাম হয়েছে ‘লখনছিরি’। বর্তমানে সুনামগঞ্জ জেলার অন্তর্গত এই গ্রাম। শাস্ত্র ছায়ায় ঘেরা এই গাঁয়ে বিখ্যাত দেওয়ান বংশে হাসন রাজা^১ জন্মগ্রহণ করেন ১২৬১ বঙ্গাব্দের ৭ পৌষ (১৮৫৪ সালের ২৪ জানুয়ারি)। তাঁর বৈমাত্রের ভ্রাতা ওবায়দুর রাজা তাঁর নাম রাখেন অহিদুর রাজা। তাঁর নামকরণ প্রসঙ্গে দেওয়ান মোঃ আজরাফ লিখেছেন,

‘সিলেটের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ফার্সী ভাষাবিদ নাজির আবদুল্লাহ বলে আলী রাজা সাহেবের এক বন্ধু তাঁর নামকরণ করেন হাসন রাজা। তদবধি তিনি অহিদুর রাজা ও হাসন রাজা এই উভয় নামেই আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব মহলে পরিচিত ছিলেন। কৈশোর পর্যন্ত নানাবিধ দলিল দস্তাবেজে তাঁকে অহিদুর রাজা বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। তবে পরিণত বয়সে তিনি হাসন রাজা নামে পরিচিত হতেই পছন্দ করতেন বলে এ নামেই তিনি সর্বসাধারণের কাছে খ্যাতি লাভ করেন।’^২

গানের ভনিতায়ও ‘হাসন রাজা’ নাম ব্যবহৃত হয়েছে এবং আমরাও তাঁকে গানের রাজা হাসন রাজা বলেই জানি।

হাসন রাজার আদি পুরুষেরা ভারতের উত্তর প্রদেশের রায়বেরিলীতে বসবাস করতেন। ষোড়শ শতাব্দীর দিকে তাঁর পূর্বপুরুষেরা এদেশে আগমন করেন। বাংলাদেশের যশোহর জেলার কাপদি গ্রামে প্রথমে বসতি স্থাপন করেন। কিংবদন্তী আছে যে, হাসন রাজার পূর্বপুরুষেরা অযোধ্যার অধিবাসী ছিলেন। জাতিতে ছিলেন আর্যগোষ্ঠীর ক্ষত্রিয় শাখার অন্তর্ভুক্ত। ভাগ্যের অন্বেষণে তাঁরা ছড়িয়ে পড়েন এবং সৈনিক বৃত্তি গ্রহণ করেন। এক সময় বর্ধমান জেলায়ও বসতি স্থাপন করেন। সেখান থেকে যশোহর জেলায়

আসেন। এই সময় তাঁরা একটি খণ্ডরাজ্য গঠন করেন। কিন্তু সেখানেও তাঁরা স্থায়ী হতে পারেননি। এই খণ্ডরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রাজা বিজয়সিং দেব পারিবারিক কলহ হেতু কনিষ্ঠ সহোদর দুর্জয় সিংহের শত্রুতায় বাধ্য হয়ে নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্য পরিত্যাগ করে সিলেট জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত বিশ্বনাথ থানার এলাকাধীন 'কুনাউড়া' গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

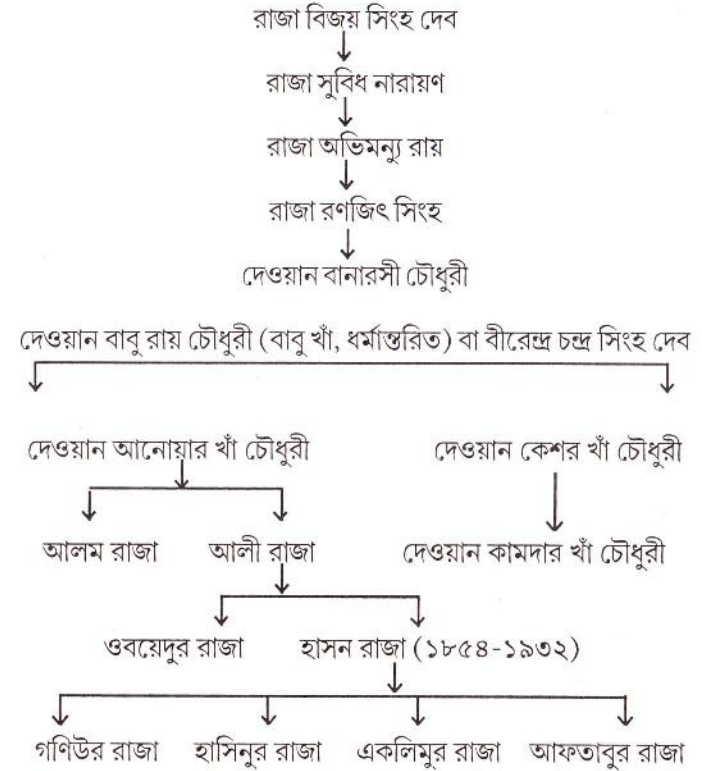
বংশ লতিকা দৃষ্টে অনুমিত হয় যে, বিজয় সিংহ ষোড়শ শতাব্দীতে কুনাউড়ায় আগমন করেন। তাঁর অধঃস্তন পুরুষে জন্মগ্রহণ করেন বানারসীরাম সিংহদেব। বানারসীরামের একমাত্র পুত্র বীরেন্দ্র চন্দ্র সিংহদেব আরবী, ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি ধর্মাস্ত্রিত হয়ে 'বাবু খান' নাম গ্রহণ করেন। এবং কয়েক পুরুষ পর দেওয়ান আলী রাজা চৌধুরী সুনামগঞ্জের নিকটবর্তী লক্ষণেশ্বরী গ্রামে স্থায়ী বাসস্থান প্রতিষ্ঠা করেন। দেওয়ান ছিল উপাধি—ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে তাঁরা এই উপাধি লাভ করেছিলেন। 'হাসন রাজা' দেওয়ান আলী রাজা সাহেবের দ্বিতীয় পুত্র। তাঁর মাতার নাম হুরমত জাহান বিবি।

অপর পৃষ্ঠায় রাজা বিজয় সিংহ দেব থেকে হাসন রাজা পর্যন্ত বংশ লতিকা দেওয়া হল যা সংগৃহীত হয়েছে সুনামগঞ্জের বর্তমান বংশধরগণের কাছ থেকে।

হাসন রাজা সত্যিকার অর্থে সুপুরুষ ছিলেন। তাঁর উঁচু দেহ, দীর্ঘ বাহু, ধারালো নাক এবং কৌকড়ানো চুল প্রাচীন আর্যদের চেহারা স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি খুব উদার ও দানশীল লোক ছিলেন। তাঁর চারিত্রিক উদারতা ও দানশীলতার অনেক গল্পকথা এখনও প্রবীন সিলেট-সুনামগঞ্জবাসীদের কাছে শোনা যায়। কবির উদার দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সমাজের কর্তৃত্বাধীন গোষ্ঠীর আঘাত সহ্য করতে হয়েছিল, তাঁকেও হতে হয়েছিল সমাজচ্যুত। সে সময়ে তিনি যেমন সুনামী পুরুষরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তেমনি দুর্নামী পুরুষরূপেও সমালোচিত ছিলেন।

শৈশব থেকেই হাসন রাজা ছিলেন দুরন্ত প্রকৃতির। পড়াশোনায় তেমন আগ্রহ ছিল না। বংশের নিয়মানুসারে তিনি শুরুতেই আরবী ভাষার চর্চা করেন এবং সেই সঙ্গে বাংলা ভাষাও পাঠ শুরু করেন। তবে বিদ্যালয়ের পড়াশোনায় তিনি বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেননি। হাসন রাজা যে যুগে জন্মেছিলেন, সে যুগে মুসলমান সমাজে ইংরেজি শিক্ষার তত প্রচলন ছিল না। নিজে আধুনিক

বংশলতিকা



শিক্ষায় বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেননি বলে হাসন রাজার মনে দুঃখ ছিল। সেজন্য সুযোগ পেলেই তিনি শিক্ষা প্রসারে সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। নারী শিক্ষা প্রসারেও তিনি সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর বড়ো বোনের নাম সহিফা বানু। তিনি শিক্ষিতা এবং একজন কবি ছিলেন। বাংলা ভাষায় রচিত তাঁর 'সহিফা সঙ্গীত' এবং উর্দু ভাষায় রচিত 'ইয়াদ পারে সহিফা' কবিতা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি প্রথমে সিলেটের মহিলা কবি এবং প্রথম হাজী বিবি।

হাসন রাজা পাখি-প্রেমিক ছিলেন। কোড়া পাখি ছিল তাঁর খুব প্রিয়। এই পাখি তিনি শিকার করতেন। কখনো পাখি শিকারে, কখনও ঘোড়া চড়ে, কখনও

বা নৌকা বিহারে তিনি সুরমার বুক বেরিয়ে পড়তেন। তাঁর অনেকগুলো প্রিয় ঘোড়া ছিল তাদের নাম রেখেছিলেন জঙ্গ বাহাদুর, চান মুশকী, মুলকী, বাংলা বাহাদুর। অনেকবার তিনি ঘোড়া দৌড়ের প্রতিযোগিতায় ইংরেজ সাহেবের ঘোড়াকে হারিয়ে 'বাজি' জিতেছেন। এইসব কারণে হাসন রাজা তাঁর জীবদ্দশাতেই সিংহাসিনীর কাছে কিংবদন্তীর নায়কে পরিণত হয়েছিলেন।

হাসন রাজা কয়েকটি বিয়ে করেছিলেন। জমিদারী কর্মকাণ্ডে বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণকালে অন্তত চারজন স্ত্রী তাঁর সঙ্গী হতেন। তাঁর রচিত একটি গান আছে যেখানে কবি বলেছেন নিজেকে —

‘যাইবায় নিয়ে হাসন রাজা রাজাগঞ্জ দিয়া আর করবায় নিরে হাসন রাজা দেশে দেশে বিয়া।’ হাসন রাজার পুত্র-কন্যাদের মধ্যে একলিমুর রাজা ছিলেন পিতার কাব্য প্রতিভার অন্যতম উত্তরাধিকারী। একলিমুর রাজার গান সাধারণ মানুষের কাছে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছিল। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র তৈমুর রাজাও বেশ কিছু গান রচনা করেছেন। শমসের রাজার সম্পাদনায় সিলেট থেকে গানের বই ‘হাসন রাজার তিন পুরুষ’ (১৫ বৈশাখ, ১৩৮৫/২৯ এপ্রিল, ১৯৭৮) প্রকাশিত হয়েছে। এতে হাসন রাজা, একলিমুর রাজা ও তৈমুর রাজার গান সংকলিত হয়েছে।

হাসন রাজার কৈশোর থেকে যৌবনকাল কেটেছে ভোগবিলাসের মধ্যে। এই সময়কালেই তাঁর জীবনে শোকের ছায়া নেমে আসে। বৈমায়েয় বড়ো ভাই ওবায়দুর রাজার মৃত্যুশোক কাটাতে না কাটাতেই চিরবিদায় নিলেন তাঁর পিতা দেওয়ান আলী রাজা। হাসন রাজার বয়স তখন মাত্র পনেরো বৎসর। স্বাভাবিকভাবেই জমিদারীর সকল দায়দায়িত্ব ন্যস্ত হল তার উপর।

তৎকালীন সিলেট সদর মহকুমার অন্তর্গত বিশ্বনাথ থানার চৌড়ীয়া পরগনার বিরাট রামপাশা এস্টেট ছাড়াও লক্ষণশ্রী, চামতলা, মহারাম, পাগলা, লাউড়, বেতাল ইত্যাদি নামে সুনামগঞ্জের নানা পরগনায় তাঁর জমিদারী বিস্তৃত করে এক বিরাট জমিদারীর অধিকারী হলেন। চঞ্চল হাসন হয়ে উঠলেন প্রবল প্রভাবশালী জমিদার। বনের মুক্ত পাখি খাঁচায় হলো বন্দি। সংসার, বিষয় সম্পত্তি ও ভোগবিলাসের মায়াজালে আবদ্ধ হলেন হাসন রাজা, বাহ্যত সংসারী ও প্রতাপশালী জমিদার হলেও তাঁর অন্তরে বেজে চলেছে মরমীয়া সুর। বিষয়সম্পত্তির ভোগবিলাসে মন ভরল না হাসনের। তাঁর অন্তরাঙ্গা কেঁদে উঠল, গান ধরলেন —

“মাটির পিঞ্জিরার মাঝে বন্দি হইয়ারে
কান্দে হাসন রাজার মন মনিয়ায় রে।”

বিশ্ব প্রকৃতির মর্মে যিনি প্রবিশ্ট, তিনিই মরমী। ইংরেজি ‘mystic’ শব্দের বাংলা অনুবাদ ‘মরমী’। গ্রিক ভাষায় Muien (ম্যুইন) থেকে শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। এই Muien শব্দটির অর্থ হল নয়ন মুদ্রিত করা, ভাব অন্তরের মহালক্ষ্যের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া। উপনিষদের ‘আবৃত চক্ষু মৃতত্মমিচ্ছন’ কথারই প্রতিধ্বনি। বিশ্বের অন্তরের সঙ্গে মানবাত্মার অন্তরঙ্গ সম্বন্ধের নিবিড় উপলব্ধি। অর্থাৎ মরমীয়া তিনি পরমাত্মার সঙ্গে যাঁর ঘনিষ্ঠ আধ্যাত্মিক পরিচয় ও অভিজ্ঞতা আছে। (A mystic is best defined as one, who has intimate spiritual experience of the divine being.)

এমনি অভিজ্ঞতার প্রকাশ হাসন রাজার গানে লক্ষ করা যায়। যেমন —

‘আয়নার মধ্যে যেমন মুখ দেখা যায়
সেই মতে আমার রূপে, দেখা দিল আমায়।’

অন্য একটি গানে অতীন্দ্রিয়লোকের অপরূপ রতনের বর্ণনা দিচ্ছেন :

কিবা শোভা বলমল করে বাঁকা তার নয়নেরে।
কালো না হয় ধলা না হয় নুরেবি চটকরে।।
ভৈসালের বৎসরে বন্ধে দরশন দিলরে,
দয়া করিয়া আমার সঙ্গে কথাবার্তা কইলারে।।
তুমি আমার, আমি তোমার বন্ধে যে বলিলরে,
আমার দুঃখের কথা শুনিয়া বন্ধের দয়া হইলরে,
নূরের বদন হাসন রাজা দিলের চক্ষে দেখলরে,
আমারে করিয়া ফানা অন্তরে ছাপাইলরে।।
এ দেখিলাম, এ নাই, কি করি উপায়রে।
প্রেমের মাতাল হইয়া হাসন রাজায় গান গায়রে।

অতীন্দ্রিয়ানুভূতি এক প্রকারের দিব্য মদিরমত্ততা, যার প্রভাবে পার্থিব পদার্থের তরল প্রবাহ থেকে আত্মাকে দূরে সরিয়ে রাখা যায়। এই মত্ততার মূলতত্ত্ব হল,

শাস্ত্র জ্ঞানের যুক্তি নিরপেক্ষ উপলব্ধি। শাস্ত্র জ্ঞানের এই যুক্তি নিরপেক্ষ অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির মর্মস্পর্শী আবেদন, কথা ও সুরের সহজ সরলভাবে ব্যক্ত করেছেন হাসন রাজা। সে জন্যেই তাঁকে আমরা বলি মরমী কবি। মরমী কবি কেবলি চান মুক্তি, অকূল পাড়ির আনন্দ গান গেয়ে চলবার মতো মুক্তি। তবে মরমী কেবল যে মুক্তি খুঁজেছেন এমন নয়, তাঁর চেষ্টার মূলে থাকে শ্রেষ্ঠ স্তরের জীবন গঠন ও ধর্ম সাধন।

এই উপমহাদেশে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসার ঘটে মূলতঃ সুফী সাধকদের মাধ্যমে। এ কথা ঐতিহাসিক ভাবেই স্বীকৃত যে, তুর্কি বিজয়ের (১২০৪) অনেক আগে থেকেই সমুদ্রপথে চট্টগ্রাম দিয়ে বহু আরবীয় বণিক ও ধর্মপ্রচারক তৎকালীন বাংলায় আসতে শুরু করেন। আরও পরে হজরত শাহ সুলতান রুমী (মস্তান গড়ে আগমন ১০৫৩ ইং) হজরত শাহজালাল (ইন্তেকাল ১৩৪৬ ইং), বাবা আদম মক্কী, শাহ সুলতান শাহী সওয়ার, খানজাহান আলী (ইন্তেকাল ১৫৫৮ ইং), শাহ ইসমাইল গাজী, শেখ জালালউদ্দিন তবরাজী (ওফাৎ, ১১৫৫ ইং) প্রমুখ অসংখ্য সুফী সন্ত দরবেশের খানকা শরীফ বা আস্তানায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল ভরে যায়। তুর্কি বিজয়ের পর স্বাভাবিক কারণেই এসব সুফী দরবেশ বর্ধিত হারে এদেশে আসতে থাকেন এবং মুসলিম রাজশক্তির কাছে থেকে লাভ করেন তাজিম বা সম্মান। এই সুফী দরবেশদের দৈনন্দিন জীবনধারা, ধর্মপরায়ণতা, আদর্শবাদ এবং সর্বোপরি সর্বভেদ সমন্বয়ী মানবতাবাদ অস্পৃশ্য ও ব্রাহ্মণ্য শাসনে অতিষ্ঠ সাধারণ নিম্ন সম্প্রদায়ের মানুষ ও নাথপন্থি বৌদ্ধদের কাছে পেল প্রশংসা। তারা দলে দলে ইসলামের শান্তিছায়ায় আশ্রয় খুঁজল। সুফী দরবেশগণ ‘সূফ’ বা পশম দ্বারা তৈরি এক প্রকার লম্বা রুম্ম পোশাক পরতেন বলে নাকি এঁদের সুফী বলা হত। পরবর্তীকালে লক্ষণীয়, এদেশের ফকির সম্প্রদায় বিশেষ করে বাউলদের মধ্যেও এই জাতীয় আলাখান্না ধরনের পোশাক বা খেরকা দেখা যেত”^৩ এবং এখনও তা লক্ষ করা যায় পশ্চিমবঙ্গের বাউলদের ও আমাদের দেশের ফকির সম্প্রদায়ের পরিধানে। এই সুফী দরবেশদের জীবনধারা যেমন বাহ্যিকভাবে প্রভাবিত করেছে তেমনি আমাদের লোকায়ত সংস্কৃতির ধারায়ও প্রভাব বিস্তার করেছে।

“একদিকে সিদ্ধাদের চর্যাপদ অন্যদিকে মরমীয়া বাউল ও বৈষ্ণব সঙ্গীত—সুফীদের প্রভাবে যে বিপ্লব সাধিত হল তা থেকে কেউই রক্ষা পেল না। পরবর্তী অজস্র মারফতি দেহতত্ত্বে তারই লোকায়ত ধারা নানা তরঙ্গভঙ্গে প্রবাহিত”^৪ এই লোকায়ত ধারার অনন্য স্বাক্ষর বহন করেছে হাসন রাজার গান। ধর্মের দিক দিয়ে সুফী মতবাদ ঈশ্বরের সঙ্গে পরিপূর্ণ এবং বাধাহীন মিলনকে মানব জীবনের একমাত্র কাম্য ও চরম সার্থকতা বলে নির্দেশ করেছে। প্রেমই মানব ও ঈশ্বরের মিলন সেতু। বিচার বুদ্ধি অথবা সাধারণ প্রেমমূলক জ্ঞান নয়। সেজন্য সুফী ধর্মকে ইসলামীয় অতীন্দ্রিয়বাদ বা মরমীয়াবাদ (Islamic Mysticism) বলা হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য হাসন রাজার গানে এই ভাবধারার অনুবর্তন প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সেই সঙ্গে সহজ সরল সুরের মর্মস্পর্শী আবেদন সমৃদ্ধ তাঁর গান। সে কারণে হাসন রাজার গানকে যথার্থই বলা যেতে পারে “মরমী গান”।

হজরত শাহজালালের পবিত্র সাহচর্যে ধন্য সিলেট ভূমি, তিনশো ষাট আউলিয়ার দেশ নামে যেমন পরিচিত তেমনি বৈষ্ণব ও সুফী সাধকদের সাধন ভূমি – ‘এই সুন্দরী শ্রীভূমি’। বৈষ্ণব ও সুফী ধর্মের মূল উপজীব্য প্রেম। এই প্রেমের পথেই সৃষ্টিকর্তার স্বরূপ সন্ধান করেছেন বৈষ্ণব ও সুফী সাধকগণ। সুফী ধর্মের মূল কথা হল – প্রেমের দ্বারাই জীবন পরম একের সাথে একাত্ম হয়ে যেতে পারে, প্রেমের সেই অবস্থাকে ‘ফানা’ বলা হয়। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “Those of the Bauls, who have Islamic leanings, call such death in life ‘Fana’, a term used by the sufis to denote union with the supreme Being”.

হাসন রাজা এই প্রেমের পথে পরম একের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। বাউল কবির যেমন ‘মনের মানুষ’ এর সন্ধানে ব্যাকুল, মরমী কবিও তেমনি হয়েছেন ‘দেওয়ানা’

“পিরীতে মোরে কবিয়াছে দেওয়ানা

হাসন রাজা পিরীত করিয়ে হইয়াছে ফানা”

কেননা “হাসন রাজার লাগিয়াছে শ্যাম পিরীতে পিরীতের টানা

বাজায় ঢোলক বাজার তবল আর গায় গানা।”

বৃহত্তর সিলেটের লৌকিক ঐতিহ্যে দুটি ধারা প্রবহমান। একটি বৈষ্ণব, অপরটি সূফী। “সুরের ছন্দ ও ভঙ্গিতে বৈষ্ণব ধারাটি হল মূলতঃ বিলম্বিত মীড় আশ্রয়ী এবং তা লীলায়িত, অনুগামী বাদ্যযন্ত্র – একতারা যুক্ত লাউয়া বা লাউ; সূফী ধারাটির সুর প্রধানতঃ গতি প্রধান, কাটাকাটা ঝটকা দেয়া, ত্রিমাত্রিক ছন্দ, অনুগামী যন্ত্র দোতারা ও খমক। বৈষ্ণব ধারার লীলায়িত চলনের মধ্যে সূফী ধারাটি নিয়ে এল এক গতির আবেগ। এই দুটি ধারারই প্রগতিশীল সামাজিক মুখ্য ভূমিকা ছিল – হিন্দু মুসলমানের এক মিলিত ভাবধারা, এক মিলিত সংস্কৃতি গড়ে তোলার। হিন্দুর গুরু, মুসলমানের মুরশিদ, হিন্দুর রাধাকৃষ্ণ, মুসলমানের আশিক মাশুক মিলে মিশে গেছে।” পূর্বেই বলেছি যে, সিলেটের লোকায়ত ধারায় সূফী মতবাদ ও শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবর্তিত প্রেমধর্মের প্রভাব পড়েছে সাহিত্য সঙ্গীত কলায়। বিশেষতঃ মারফতি, দেহতত্ত্ব, বাউল, কীর্তন, সারি, ভাটিয়ালি, মুরশিদী, মরমীয়া সঙ্গীতে এর অনুবর্তন এখনও বয়ে চলছে। শ্রীচৈতন্যদেবের (১৪৮৬ - ১৫৩৩) যে প্রেমধর্মের প্রচলন করেন তার মূল প্রেরণা সূফী মতবাদ -- একথা ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক আলোচনা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন এবং সূফী সাহিত্য ও বৈষ্ণব সাহিত্যের মধ্যে সাদৃশ্য সম্বন্ধে আলোকপাত করে দেখিয়েছেন,

‘গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের এই ‘নামে রুচি জীবে দয়া’ মুসলিম সূফী সাধকদের ‘জিকর’ ও ‘খিদমত’ নীতির নামান্তর। এতে ইসলামের সাম্য, উদারতা ও ভ্রাতৃত্বের ছাপও স্পষ্ট, অধিকন্তু সূফীদের ‘সমা’ ও বৈষ্ণবদের ‘কীর্তনে’ও কোনো তফাৎ নেই। এই কীর্তনের শেষে বৈষ্ণবদের যে ‘দশা’ হয়, যে শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ফুটে উঠে, সূফীদের ‘হানের’ অবস্থাও তাই। কীর্তন ও সমা এবং দশা ও হান শব্দার্থ, ভাব সম্পাদন ব্যবস্থা ও মানসিক অনুভূতির দিক হতে একই বস্তুর অভিব্যক্তি। বিশেষতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ‘প্রেম’ সূফীদের ‘ইশক’ রাধাকৃষ্ণ সূফীদের ‘সাকী’ ও বুৎ কিংবা ‘সমা’ ও ‘পরওয়ানা’ ঐশ্বর্য সূফীদের ‘কিয়ামত’ ছাড়া কিছুই নয়।”

তেমনি সূফীদের ‘গাজীমিয়াৎ’ ও বৈষ্ণবদের ‘পদাবলী’ ভাব ও রচনা উভয়দিক হতে অনেকখানি এক। সূফী সাহিত্যের ‘আশিক’ ও ‘মাশুক’ বৈষ্ণব পদাবলীর ‘রাধা’ ও ‘কৃষ্ণ’। এই সাহিত্যের ‘হিজরান’ ও ‘বিশান’ বৈষ্ণব পদাবলীর ‘বিরহ’ ও ‘মিলন’। স্বাভাবিকভাবেই সিলেটের লোকায়ত সঙ্গীতে

এই যুগল সাহিত্য ধারার প্রভাব পড়েছে। বৈষ্ণব সাহিত্য ও সূফী সাহিত্যের সম্মিলনে সিলেটের মনোজগৎকে করে তুলেছে উদার মতাবলম্বী, উদ্দীপ্ত করে তুলেছে মানবতার বীজ মস্ত্রে। তাই বলা যায়, আমাদের বাউল মরমীয়া সঙ্গীতে ধ্বনিত হয়েছে মানবতারই চরমবাণী। (নানান বরণ গাভীরে মনাই একই বরণ দুধ – আপন মনে ভেবে দেখো আমরা একই মায়ের পুত্র।) হাসন রাজার গানেও শুনি তার সরল স্বাভাবিক ভাষায় মানবতার সেই চিরন্তন বাণীর উচ্চারণ। ‘বৈষ্ণব ও সূফী ধারার’ এই যুগল ধারার যোগ্য উত্তরাধিকারী হাসন রাজাও এই প্রেমের পথেই পরম একের সঙ্গে মিলনের তারে গান গেয়ে উঠেছেন – পরম মানব সম্মিলনের। তাঁর পাশে ‘আশিক’ ও ‘মাশুক’, ‘রাধা ও কৃষ্ণ’ তত্ত্ব মিলে মিশে এক হয়ে গেছে। ধর্মের সকল বিভেদ অতিক্রম করে গেয়ে উঠেছেন মাটি ও মানুষের গান।

হাসন রাজার গানে কাব্য সম্পদের চেয়ে নিরাভরণ হৃদয়ানুভূতির সহজ সরল প্রকাশ ঘটেছে। এর মধ্যে কোনো পুঁথিগত বিদ্যা নেই, কোনো কৃত্রিমতা নেই, আছে খাঁটি অনুভূতি। সহজ সরল কথার সঙ্গে আঞ্চলিক সূত্রের মিলনে তাঁর গানে নিজস্ব এক রূপ বা Style (গায়কী) ফুটে উঠেছে। কিছু গানে অপভাষা (Slang) ব্যবহার করেছেন এবং কয়েকটি গানে ছন্দপতন ঘটেছে। কিন্তু কাব্যিক মূল্যের চেয়েও তাঁর গানের তত্ত্ব ও দর্শন এবং সুরের মর্মস্পর্শী আবেদন আমাদের লোকায়ত সঙ্গীতে অনন্যধারা সংযোজিত করেছে।

‘শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীতের সুর বিচার’ নিবন্ধে প্রয়াত লোকশিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাস হাসন রাজার গানের বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, সিলেটের ‘মুরশিদী’ বা ‘মায়ফতি’ গানের সুরের বিশেষ ঢঙের (স্টাইল) সাথে উত্তরবঙ্গের চটকদার সুর ও ছন্দের নৈকট্য আছে। হাসন রাজার জনপ্রিয় ও বহুল প্রচলিত একটি গান নমুনা হিসেবে দেখা যাক।

লোকে বলে, বলেরে, ঘরবাড়ী বালা না আমার

কি ঘর বানাইয়ি আমি শূন্যের মাঝার

“মুরশিদী গানের সমে সমে ঝুঁকি দিয়ে গাইবার ঢংটি চটকার ঢঙের সাথে মিলে যায়। আরেকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। সেটি হলো, একই পায়ে দাঁড়িয়ে এক সঙ্গে

দ্রুত গতিতে গানের প্রথম সারির কিছু কথা এমনি ভাবে বলে যাওয়া যা হঠাৎ গানের তাল ও সুরের বাইরে সংলাপের মতো মনে হবে।

লৌকিক ঐতিহ্যের সমষ্টি রচনা থেকে যখন ব্যক্তি রচনার যুগ এল, তখন ব্যক্তি বিশেষকে অবলম্বন করে অনেক সময় গায়কীর স্টাইলও প্রচলিত হতে লাগল। যেমন, এ যুগে ময়মনসিংহে জালালুদ্দিন ও দীন শরতের একটি বিশেষ স্টাইল চালু আছে তেমনি, সিলেটেও রাধারমন, হাসন রাজা প্রমুখের নামে বিশেষ গায়কী আখ্যা পেয়ে আসছে। পূর্বেই বলেছি যে, হাসন রাজার গানে কথার সঙ্গে আঞ্চলিক সুরের মিলনে যে এক বিশিষ্টতার ছাপ লক্ষ্য করা যায় যাকে সাঙ্গীতিক পরিভাষায় বলা যেতে পারে ‘গায়কী ঘরানা’। হাসন রাজার গানে নিজস্ব গায়কী ঘরানার মৌলিকতার সুস্পষ্ট ছাপ পড়েছে। যে কারণে তাঁর রচিত গানগুলিকে ‘হাসন রাজার গান’ বলে চিহ্নিত করাই সমীচীন। লালনের গান যেমন লালনগীতি বলে পরিচিত তেমনি হাসন রাজার রচিত গানগুলিও ‘হাসনগীতি’ বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

হাসন রাজার গানের সংখ্যা প্রায় দুশো থেকে দুশো দশটির মতো। আরও কিছু গান ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে, হয়তো বা এখনও সংগ্রহের অপেক্ষায় আছে। শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, কার্তিক ১৩৪৫ সংখ্যা (পৃষ্ঠা ২৯) থেকে জানা যায় যে – “সুনামগঞ্জের জমিদার সাধক কবি দেওয়ান হাসন রাজা চৌধুরী মহাশয় খুব সঙ্গীত প্রিয় লোক ছিলেন। তিনি শুধু গান দ্বারা ‘হাসন উদাস’ নামে বৃহৎ পুঁথি রচনা করে ছাপিয়ে ছিলেন। এখন তা দুপ্রাপ্য”। ৮

হাসন রাজা জীবিতকালে ১৯১৪ সালে ‘হাসন উদাস’ ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পর কবির বড় পুত্র দেওয়ান গনিউর রাজা ‘হাসন-উদাস’ এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন ১৯৩৩ সনের ১৭ বৈশাখ। গানের সংখ্যা ২০৬টি। দেওয়ান শমসের রাজার সম্পাদনায় ‘হাসন রাজার তিন পুরুষ’ গানের বই প্রকাশিত হয় ১৫ বৈশাখ, ১৮৮৫ তে (২৯ এপ্রিল, ১৯৭৮)। বইটিতে হাসন রাজার ১৯১টি গান সংকলিত হয়েছে।

মুখ্যতঃ গীত রচয়িতা এবং এক সংস্কারমুক্ত জীবনদর্শনের নিঃসঙ্গ যাত্রী হাসন রাজা। কবি রবীন্দ্রনাথই (১৮৬১-১৯৪১) প্রথম অখ্যাত এই গ্রাম্যকবির গানের যথার্থ মূল্যায়ন করেন বিশ্বসভায়। বলা যেতে পারে হাসন রাজা ‘রবীন্দ্রনাথের আবিষ্কার’। কবি রবীন্দ্রনাথ প্রভাতচন্দ্র শর্মার মাধ্যমে হাসন

রাজার ৮৩টি গানের সঙ্গে পরিচিত হন এবং সেই সময় অর্থাৎ ১৯২৫ সালে ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের ভাষণদানের সময় তাঁর হাতে এসে পড়ে এবং তাঁর সেই বিখ্যাত বক্তৃতায় হাসন রাজার দুটি গানের ভাবদর্শন আলোচনা করেন। পরবর্তীকালে ১৯৩১ সাল লন্ডনে হিবার্ট বক্তৃতায় হাসন রাজার গান কবি উদ্ধৃত করেন। স্বাভাবিকভাবেই স্বদেশে এবং বিদেশে হাসন রাজার গান সম্পর্কে সূধী সমাজে আগ্রহ ও কৌতূহল জেগে ওঠে।

হাসন রাজার গান নিয়ে যাঁরা সংগ্রহ, লেখালেখি ও গবেষণাকাজে ব্যাপৃত তাঁদের মধ্যে অন্যতম কয়েকজনের নাম উল্লেখ্য, যেমন – প্রভাতচন্দ্র শর্মা, সৈয়দ মুজতবা আলী, দেওয়ান মোঃ আজরফ, ক্ষিতিমোহন সেন, নৃপেন্দ্রলাল দাশ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, দেওয়ান তৈমুর রাজা, দেওয়ান শমসের রাজা, দেওয়ান শামসুল আবেদীন, অমিয় শঙ্কর চৌধুরী, শামসুজ্জামান খান, দেওয়ান মহসীন রাজা প্রমুখ।

হাসন রাজার গান গেয়ে যিনি সর্বস্তরের মানুষের কাছে এবং দেশে বিদেশে বিমুগ্ধ এবং তাঁর গান জনপ্রিয় করে তুলেছেন তিনি প্রয়াত লোকশিল্পী নির্মালেন্দু চৌধুরী। নির্মালেন্দু চৌধুরী তাঁর কণ্ঠমাধুর্যে হাসন রাজার গান যেমন মোহিত করেছেন বাংলাভাষী মানুষের কাছে তেমনি ইউরোপ, আমেরিকায় গান গেয়ে বিমুগ্ধ করেছেন ভিন্নভাষী মানুষদের। গণসঙ্গীত শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাস হাসন রাজার গান নিয়ে লেখালেখি করেছেন এবং তাঁর গানের সুর বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ করেছেন। পরবর্তীকালে গণমাধ্যমেও হাসন রাজার গান প্রচারিত হতে থাকে। বিশেষতঃ বাংলাদেশ বেতার সিলেট কেন্দ্র থেকে নিয়মিত হাসন রাজার গান পরিবেশিত হতে থাকে। সিলেট সুনামগঞ্জ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠানিকভাবে হাসন রাজার গান প্রচার-প্রসার, শিক্ষা-গবেষণার চেষ্টা চললেও তা এখনও বিজ্ঞানমনস্ক রূপ নেয়নি। ১৯৭৫ সালে সুনামগঞ্জ হাসন রাজা স্মৃতি পরিষদের উদ্যোগে হাসন রাজার জন্মোৎসব পালিত হয়। সেই সময় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উক্ত পরিষদকে পঁচিশ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করেন হাসন রাজার গান সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও গবেষণার জন্য। এখনও এই অর্থ অব্যবহৃত রয়ে গেছে এবং হাসন রাজা স্মৃতি পরিষদেরও কোনো উদ্যোগ বা কোনো কার্যক্রম নেই। হাসন রাজাকে নিয়ে কোনো

একাডেমি বা ইনস্টিটিউট গড়ে উঠেনি, কেবলমাত্র ব্যক্তিগত পর্যায়ে আর পারিবারিক উদ্যোগে তাঁর জন্মোৎসব পালিত হয় বিক্ষিপ্ত ভাবে।

স্বাধীনতাপূর্ব এবং পরবর্তী বাংলাদেশে হাসন রাজার গান যাঁরা গেয়েছেন এবং গেয়ে চলেছেন তাঁদের অন্যতম কয়েকজন হলেন : শিল্পী উজির মিয়া, আরতি ধর, এমরান আলী, বিদিত লাল দাশ, ইয়ারুন্নেসা পঞ্চী, ফটিক চন্দ্র চন্দ, আব্দুর রহমান, স্বপ্না দে, শফিকুল নূর, রত্না ভট্টাচার্য, মাহমুদুর রহমান পান্না, সোহেল আহমেদ, আকরামুল ইসলাম প্রমুখ। বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে তাঁর গান নানাভাবে প্রচারিত হলেও অবিকৃত রূপকে হারিয়ে ফেলেছে। এমনকি ব্যান্ডের মাঝেও তাঁর গান গীত হচ্ছে, যা তাঁর গানের বৈশিষ্ট্যকে ব্যাহত করেছে। হাসন রাজার গান দেশে যেমন, তেমনি বিদেশেও তাঁর গানের ভাবদর্শন নিয়ে আগ্রহ ঔৎসুক্য লক্ষ করা যায়।

ইউরোপ আমেরিকায় বিশেষতঃ লন্ডন, নিউইয়র্কে হাসন রাজার গান নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। প্রবাসী সিলেটবাসীদের যে কোনো উৎসব অনুষ্ঠানে হাসন রাজার গান নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। প্রবাসী সিলেটবাসীদের যে কোনো উৎসব অনুষ্ঠানে হাসন রাজার গান অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গন্য এবং গীত হয়ে থাকে। আমেরিকান গবেষক এডওয়ার্ড ইয়েজিয়ান ‘100 Songs of Hason Raja’ নামে বই লেখেন ১৯৯৯ সালে ইংরেজি ভাষায়।

লন্ডন প্রবাসী আমানউদ্দিন লিখেছেন, ‘হাসন রাজার উচ্চানুভূতি, প্রেম ও বৈরাগ্য ভাবনা’ বইটি ১৯৯৮ সালে। ১৯৮৫ সালে মুক্তধারা প্রকাশ করেছে প্রভাতচন্দ্র গুপ্তের লেখা ‘গানের রাজা হাসন রাজা’। হাসন রাজার ৭৫ তম মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে বাংলা একাডেমী ঢাকা ১৯৯৮ সালে প্রকাশ করে স্মারকগ্রন্থ ‘প্রসঙ্গ হাসন রাজা’ ড. আবুল আহসান চৌধুরীর সম্পাদনায়। মোঃ রফিকুল ইসলাম মিয়া তাঁর কবিতার পঙ্ক্তিমালায় হাসন রাজার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বই রচনা করেছেন ১৯৯৯ সালে ‘হাসন রাজার দেশে’ নামে। হাসন রাজার জীবনী ও গান নিয়ে বইপত্র রচনা করেছেন : সাদিয়া চৌধুরী পরাগ ‘প্রেমবাজারে হাসন রাজা’ এবং ‘প্রেম সাগরে হাসন রাজা’ বইটি লিখেছেন মোঃ রফিকুল ইসলাম মিয়া ২০০১ সালে। ২০০০

সালে দেওয়ান মোহাম্মদ তাছওর রাজার গ্রন্থনা ও সম্পাদনায় কবির জীবন ও কর্ম নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে ‘হাসন রাজা সমগ্র’। এমনভাবে দেশে বিদেশে বইপত্র, অডিও সিডি, ভিসিডি এবং চলচ্চিত্রে হাসন রাজার গান নিয়মিত প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়ে চলেছে। ঢাকার হেলাল খানের পরিচালনায় নির্মিত হয়েছে ‘হাসন রাজা’ চলচ্চিত্রটি। চলচ্চিত্রটি যেমন একদিকে নন্দিত তেমনি নন্দিতও হয়েছে। হাসন রাজার গান ক্রমে ক্রমে বাংলাভাষী মানুষের কাছে যেমন জনপ্রিয় তেমনি ভিন্নভাষী মানুষের কাছেও সমাদৃত ও সুপ্রিয় হয়ে উঠেছে তাঁর মরমী রসের ভাবধারায়।

হাসন রাজা তাঁর জীবনের বিভিন্ন সময়ে গান রচনা করেছেন। মুখে মুখে গান রচনা করে যেতেন আর তাঁর কর্মচারীরা তা লিপিবদ্ধ করতেন। “রাতে খাওয়া দাওয়া করে তিনি গান রচনা করতেন এবং সে গানে সুর দিয়ে তাঁর গায়িকাদের দ্বারা গাওয়াতেন। নিজ হাতে তিনি ঢোলক বাজাতেন, ক্লাস্ট হলে আবিদ আলী বলে তার প্রিয় খানসামার হাতে ঢোলক তুলে দিতেন। এ ঢোলকের সঙ্গে মন্দিরা বাজাতো সোনাভান নান্মী এক গায়িকা। তবে এদের মধ্যে তাঁর পরিচরিকা দিলারামই ছিল গানের মজলিসের পরিচালক। এই গানগুলিই পরবর্তীকালে ‘হাসন-উদাস’ নামে পুস্তকে ঠাঁই পায়”।^৯

প্রেমিক সম্বন্ধে হাসন রাজার সহজ সরল উক্তি :

‘পীরিতের মানুষ যারা
আউলা ঝাউলা হয়রে তারা
হাসন রাজায় পীরিত করিয়া
হইয়াছে বুদ্ধিহারা’।

শেক্সপিয়ার যেমন বলেছেন : ‘The Philosopher, the lover, and the lunatic are by imagination all compact’

হাসন রাজারও তেমনি অনুভূতি :

লাগিলরে পীরিতের নিশা
হাসন রাজায় হইল বেদিশা

ছাড়িয়া দিব লক্ষণশ্রী আর রামপাশা,
বন্ধু কেবল মনে করি জঙ্গল করব বাসা।

অধরা সেই অলখ বন্ধুর প্রেমে হাসন রাজা মজেছেন। সেই বন্ধুপ্রেমে হাসন
আত্মহারা, বন্ধুদর্শন লাভে সব কিছু ত্যাগ করে বনবাস করতেও তাঁর কোনো
দ্বিধা নেই।

কেননা, তাঁর নয়নে প্রেমের নেশা লেগেছে—

‘নিশা লাগিলরে বাঁকা দুই নয়নে—
হাসন রাজা পিয়ারীর প্রেমে মজিলরে’।

যার ‘চাঁদ মুখ’ দর্শন করলে সকল দুঃখ দূর হয় -- জীবন সার্থক হয় তিনি যে
অধরা। সেই অধরার দেখা না পেয়ে হাসন রাজা ব্যাকুল। কিন্তু কার সঙ্গে
মিলনের তরে, দর্শন লাভের জন্য এমন আকুল প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছেন
মরমী? কবি তাঁর গানেই এর উত্তর দিয়েছেন :

“বাউলা কে বানাইলরে হাসন রাজারে
বাউলা কে বানাইলরে।
বানাইল বানাইল বাউলা তার নাম হয় মৌলা।
দেখিয়া তার রূপের চটক হাসন রাজা হইল আউলা।”

বাউল-মরমীয়া গানে সৃষ্টিকর্তা জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সর্বজনীন এক ‘প্রেমিক
পুরুষ’ রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনিই বাউলের ‘মনের মানুষ’, ফকিরের
‘আলেক সাঁই’, রবীন্দ্রনাথের ‘প্রাণের মানুষ’, লালনের ‘অচিন পাখি’, হাসন
রাজার ‘মৌলা’, ‘খোদা’ কানাই, ‘হাসন জান’, ‘সোনাবন্ধু’ তিনি অধরচাঁদ।
মানব অন্তরে যে পরম সুন্দর অবস্থান করছেন তিনি অধরা। ধরা দিয়েও ধরা
দেন না। বাউল সাধকগণ তাকেই খুঁজে বেড়ান নক্ষত্র খচিত আকাশে,
পুষ্পশোভিত বনভূমিতে, আপন বাহির, মিলন-বিরহের মাঝে। মনের মাঝে
মনের মানুষের অনুসন্ধানে রত বাউল সাধক কবি। মনের মানুষকে পাবার
অস্বেষণে রত বাউল গগণ তাই কেঁদে মরে :

“আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যেরে
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশ্যে
দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে”।

এখানে একটি বিষয় স্মরণীয় যে, বাউলদের সাধনা ও সূফীদের সাধনার মধ্যে
পার্থক্য বিদ্যমান। সূফীদের সাধনা – মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে প্রেমের সাধনা।
প্রেমের তীব্রতায় পরমাত্মা ও জীবাত্মার একপ্রকার অভেদ জ্ঞানই তাদের সাধনার
মূল ভিত্তি। সূফীদের সাধনা জ্ঞানমূলক ও বিশেষভাবে অনুভূতিমূলক সাধনা।
বাউলদের সাধনা নির্দিষ্ট যোগমূলক ক্রিয়া, প্রকৃতি পুরুষের মিলনের মধ্য দিয়ে
নিজের আনন্দ স্বরূপের উপলব্ধির সাধনা। হাসন রাজা এই অর্থে বাউল নন।
পরম্পরাগত বা ঐতিহ্যধারায় নেমে আসা কোনো বাউল সম্প্রদায়ের সঙ্গে
কখনো যুক্ত ছিলেন না। তবে বাউলদের সর্বভেদ সমন্বয়বাদ ও মানবতাবাদের
প্রভাব তাঁর গানে পড়েছে। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ জানিয়েছেন যে, “হাসন
রাজা যৌবনেই সৈয়দ মাহমুদ আলী বলে পাঞ্জাব থেকে আগত চিশতিয়া
তরিকার এক দরবেশের কাছে মুরীদ হয়েছিলেন” এবং “ক্রমবিকাশের ধারায়
তিনি একজন দার্শনিকরূপে দেখা দিয়েছিলেন।”^{১০}

হাসন রাজার গানে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রেমেরই জয়গান ধ্বনিত
হয়েছে। তাঁর ব্যক্তি চেতনায় ব্যক্ত হয়েছে বিশ্বপ্রেমের বাণী। অখ্যাত গ্রাম্য
কবির গানে দার্শনিকতার পরিচয় দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ১৯২৫ সালে দর্শন
কংগ্রেসের সভায় ও পরবর্তীতে লন্ডনে হিবার্ট বক্তৃতায় (১৯৩০) হাসন রাজার
দুটি গানের উল্লেখ করে বলেন। “পূর্ব বঙ্গের একটি গ্রাম্য কবির গানে দর্শনের
একটি বড় তত্ত্ব পাই। সেটি এই যে, ব্যক্তি স্বরূপের সহিত সম্বন্ধ সূত্রই
বিশ্বসত্য।” তিনি গাইলেন—

‘মম আঁখি হইতে পয়দা আসমান জমিন
শরীর করিল পয়দা শক্ত আর নরম।
আর পয়দা করিয়াছে ঠান্ডা আর গরম,
নাকে পয়দা করিয়াছে খুশবয় বদবয়।’

এই সাধক কবি দেখিতেছেন যে, শাস্ত্রত পুরুষ তাঁহারই ভিতর হইতে বাহির হইয়া তাঁহার নয়নপথে আবির্ভূত হইলেন। বৈদিক ঋষিরাও এমনিভাবে বলিয়াছেন যে, যে পুরুষ তাঁহার মধ্যে তিনিই আদিত্যমণ্ডলে অধিষ্ঠিত।

‘রূপ দেখিলাম রে নয়নে আপনার রূপ দেখিলামরে
আমার মাঝত বাহির হইয়া দেখা দিল আমারে।’^{১১}

রোমান্টিক বা মরমী কবির স্বরূপতঃ ভাববাদী দর্শনে আস্ত্রাবান। ভাববাদী কবির Real World-এর চেয়ে Ideal World-কেই বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। বস্তু বাস্তবে কেমন এটা কবির কাছে বড় কথা নয়, বস্তু তাঁর কাছে কেমনভাবে প্রতিফলিত বা প্রতিভাত হল – এটাই তার আস্বাদ্য বিষয় এবং এই নিত্য সত্ত্বা ‘নিত্য আমি’ অসীমেরই অংশ। এই মানবতার মূল নিহিত রয়েছে ব্যক্তির নিজের সত্ত্বায় আস্বা ও শ্রদ্ধা। এই ব্যক্তিসত্ত্বায় মরমী কবির যে অকুণ্ঠ আস্বা ও শ্রদ্ধা আছে তার পরিচয় কয়েকটি গানে ফুটে উঠেছে। একটি এখানে উল্লেখ্য :

“আমিই মূল নাগর রে
আসিয়াছি খেইডু খেলিতে ভবসাগরে রে।
আমি রাধা, আমি কানু, আমি শিব শংকরী
অধর চাঁদ হই আমি আমি গৌর হরি
আমি মূল, আমি কূল, আমি সর্ব ঠাই,
আমি বিনে এ সংসারে অন্য কিছু নাই।”

গানের প্রথম চরণেই ব্যক্তিসত্ত্বার স্পর্ধিত আত্মগৌরবের অকুণ্ঠ প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের গানে প্রতিফলিত হয়—

“আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম হতো যে মিছে
তাই তোমার আনন্দ আমার পর

তুমি ভাই এসেছ নীচে।”

কবি বিশ্বাস করেন, এই বিশ্ব সৃষ্টির মূলে রয়েছে প্রেমময় সৃষ্টিকর্তার আনন্দ সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা। মানুষ বিধাতারই আনন্দসঙ্গী। কিন্তু এই যে সৃষ্টি যা অপরূপ হয়ে উদ্ভাসিত সে তো অপরূপ বলে উপলব্ধি করার মতো ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি হয়েছে বলে। অহংবোধ, ‘আমি’ বোধই তো ব্যক্তিত্ব। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ এই ‘আমিত্ব’ যা উপলব্ধি করে, অনুভব করে। ইহ জগৎ যখন বিধাতার সাধনার প্রকাশ তখন ‘আমি’ বা ব্যক্তিত্বের সৃজনও তাঁর। ইন্দ্রিয়ের জগৎ থেকে অদ্বৈতময় সত্ত্বায় পৌঁছোতে চান কবি।

তাঁর অপর একটি গানে প্রকাশ পেয়েছে --

আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবেনা।
এই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা।।
ব্যবসা মোর তোমার সাথে চলবে বেড়ে দিনে রাতে
আপনা নিয়ে করবো যতই বেচা কেনা।।

হাসন রাজার গানেও সেই “আমি” সত্ত্বার জয়গান ধ্বনিত হয়েছে —

“আপন চিনিলে দেখ খোদা চিনা যায়।
হাসন রাজা আপন চিনিয়ে এই গান গায়”।

মরমী এই গানটিতে “আমি”র পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে -- আমি হতে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে, আমি হতে এই ত্রিজগৎ, আমি হতে সৃষ্টি হয়েছে ধ্বনি। আমি সুন্দর, আমি ধ্বংস, আমি ভিতর ও বাহির, চিন্তা ও বাক্য, আমি প্রকাশ ও অপ্রকাশ। আমার দৃষ্টিতে সৃষ্টি হয়েছে আকাশ ও পৃথিবী এই দৃশ্যমান জগৎ। এইরূপ, আমার কর্ণ হতে সৃষ্টি হয়েছে এই দুই শব্দ, এই ধ্বনি, আমার শরীর থেকে সৃষ্টি হয়েছে শক্ত ও নরম, ঠান্ডা ও গরম, এই স্পর্শ, আমি নাসিকা দ্বারা দৃষ্টি করেছি এই গন্ধ, আমি জিহ্বা দ্বারা সৃষ্টি করেছি এই রস মিষ্ট ও তিক্ত। আমার তো আদি অন্ত নেই। জীবনের তো শেষ নেই, সে তো চিরকাল জীবিত। আমি আপনাকে চিনেছি, আপনাকে জেনে আমি বলছি — আপনাকে চিনলে তাঁকে চেনা যায়।” ব্যক্তিসত্ত্বার সগৌরব ও

সমুজ্জ্বল আত্মঘোষণা হাসন রাজার গানে যেমন প্রকাশ পেয়েছে.... আমাদের লোকায়ত রচনায় সে এক বিরল দৃষ্টান্ত।

হাসন রাজার বিষয় সম্পত্তি ও সঙ্গতির তুলনায় তাঁর ঘর-বাড়ী তেমন আকর্ষণীয় বা বিলাসবহুল ছিল না। নিজে অতি সাধারণভাবে দিনযাপন করতেন। এই নিয়ে আত্মীয় পরিজন অনুযোগ করলে কবি তাঁর স্বভাব সুলভ ভাষায় বলতেন :

“কি ঘর বানাইমু আমি শূন্যের মাঝার
লোকে বলে, বলেরে ঘর বাড়ী বালা না আমার।
আগে যদি জানত হাসন বাঁচব কতদিন –
দালান কোঠা বানাইত করিয়া রঙ্গিন।”

এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর অনিত্যতা সম্বন্ধে কবি সচেতন ছিলেন। কয়েকটি গানে তার পরিচয়ও পাওয়া যায়। হাসন রাজা তার জীবিত কালেই সাধের (প্রিয়) লক্ষণশ্রীতে নিজের কবর তৈরি করে রেখেছিলেন। এ সম্বন্ধে হাসন উদাস (দ্বিতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন যে,

“হাসন রাজার বাড়ী দেখানো সম্পর্কে একটি সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। ঘটনাটি সত্য।”^{২২} কয়েকজন বিদেশী ভ্রমলোক কবির বাড়ী দেখতে চান। বাড়ীর সম্মুখে সাধারণ পোষাক পরিধান করে কবি পায়চারী করছিলেন। তাঁকে চিনতে না পেরে কবিকেই জানালেন তাঁরা – “আমরা হাসন রাজা সাহেবের বাড়ী দেখতে এসেছি।” কবি আগ্রহের সঙ্গে মাঠের পথ ধরে তাদের নিয়ে গেলেন সেখানে – যেখানে তাঁর কবর তৈরী হচ্ছিল। সেই চিরদিনকার বাড়ীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, ‘ঐ দেখুন আমার বাড়ী।’

এই অনিত্য সংসার থেকে চলে যাওয়ার ইঙ্গিত হাসন রাজার গানে ধ্বনিত হয়েছে এইভাবে –

“মরণ কথা স্মরণ হইল নারে
হাসন রাজা তোর মরণ কথা স্মরণ হইল না,
যখন মরিয়া যাইবার, মাটিতে হইব বাসা,
তখন কোথায় রইব লক্ষণ ছিরি রঙ্গের রামপাশা।”

এই সংসারেতে কেউ তো চিরস্থায়ী নয়। সবাইকে যেতে হবে একদিন না একদিন। কবিও তার গানে স্মরণ করতে চেয়েছেন সেই চিরন্তন সত্যকে –

‘ওমন যাইবার রে ছাড়িয়া
কেহ নাহি পাইবে তোমায় সংসার টুঁড়িয়া।
কিসের আশা, কিসের বাসা, কিসের সংসার
নইলে পরে ভাবিয়া দেখো কিছু নয় তোমার।’

ওপারে যাবার ডাক শুনতে পেলেন কবি। চিরদিনের যে গন্তব্য অনন্ত মিলনের গানে যা মুখরিত সেই চির প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলনের তরে হাসন রাজা ইহলোক ত্যাগ করলেন ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ২২ অগ্রহায়ণ (১৯ নভেম্বর, ১৯২২ ইং)। কবির বাসনা পূর্ণ হল, তাঁর গানে সেই সুর বেজেছে :

“আমি যাইমু রে যাইমু আল্লার সঙ্গে
হাসন রাজা আল্লা বিনে কিছু নাহি মাংগে।”

হাসন রাজা প্রেমের বিরহ ও মিলনের গভীর নির্জন পথ ধরে পৌঁছোতে চেয়েছেন অতীন্দ্রিয়লোকে, পরম একের সঙ্গে একাত্মসাধনে। প্রেমই যে ঈশ্বরমুখী গন্তব্যের একমাত্র পাথেয় সেকথা কবির গানে বার বার ফুটে উঠেছে। কবি নিজেও প্রথমে চিহ্নিত করেছেন প্রেমিকরূপে –

‘হাসন রাজা প্রেমের মানুষ
প্রেমের নাচন নাচন করে
হরি বলো মন হরি বলো মন
বিকিয়ে হরির প্রেম বাজারে’।

প্রেমিক কবি এই জগৎকে প্রেমের বাজার রূপে জেনেছেন, সাধু যেইজন – সেই এই প্রেম বাজারে রত্নের সন্ধান পায় সেই-ই হয় দ্বিগুণ লাভবান, কবি গেয়েছেন :

“প্রেমের বাজারে বিকে মানিক সোনারে
যেই জানে চিনিয়া কিনে লভ্য হয় তার দুনারে”।

কেননা, কবি মনে করেন –

“প্রেম বাজারে বিকে রত্ন ভব বাজারে নাই
সাধু যারা শীঘ্র তারা খরিদ করা চাই।”

হাসন রাজার প্রেম, বৈরাগ্য ও অতীন্দ্রিয়ানুভূতি বিষয়ক গানের মধ্যে প্রেম বিষয়ক গানই বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রেমের মিলন ও বৈরাগ্যের পথ ধরেই কবি বলেছেন অতীন্দ্রিয়ালোকের সন্ধান। হাসন রাজা প্রেমেরই জয়গান গেয়েছেন। তাঁর দৃঢ় আস্থা বিশ্বাস :

‘অন্য পক্ষে না যাইয়া প্রেম – পক্ষে গেলে
পাইবায় পাইবায় খোদা হাসন রাজায় বলে’।

প্রেমই যে পরম প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলিত হবার একমাত্র পথ ও পাথর, সেই পথে প্রেমিক ছাড়া অপ্রেমিক যেন তাঁর গানের রসলোকের যাত্রী হবার অযোগ্য এবং যিনি প্রেমচৈতন্য লালন করেন না তাঁকে কবি হাসন উদাসের পরিমণ্ডল থেকে দূরে থাকতেই নির্দেশ দিয়েছেন। মানা করছেন তাঁর গান না শুনতে—তাঁর বই না পড়তে

আমি করিবে মানা অপ্রেমিকে গান আমার শুনবে না
কিরা দিই কসম দিই আমার বই কেউ হাতে নিবে না।
বারে বারে করি মানা বই আমার পড়বে না,
প্রেমের প্রেমিক যেই জনা এ সংসারে হবে না।।
অপ্রেমিক গান শুনলে কিছুমাত্র বুঝবে না,
কানার হাতে সোনার দিলে লাল ধলা চিনবে না।।
হাসন রাজায় কছম দেয়— আর দেয় মানা
আমার গান শুনবে না যার প্রেম নাই জানা।।

এ বড় আজব কুদরতি
আঠারো মোকামের মাঝে জ্বলছে
একটা রূপের বাতি।

স্ব-সিদ্ধি পারে সে বিন্দুধার,
কার সাধ্য যেতে পারে।
আছে মূলেতে মূল, সে ধারার মূল,
তত্ত্ব কর আধারে।

‘ফকির-ফাকরা-আ(উ)ল-বা(উ)ল’-দে র গান ও তার অণু-সঙ্গ ঘিরে দু-চার কথা

অরূপ দাস

ভগিতা : পাঠকের কাছে প্রথমেই সাফাই গেয়ে নেওয়া ভালো এই শিরোনামের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বা বর্গ-গোষ্ঠি বিশেষের অবমাননা-অসম্মান করা লেখকের উদ্দেশ্য নয়। লেখকের ‘আরশি নগর’ এর পড়শি হিসেবে তালগোলে কি করে যেন ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য হয়ে যাওয়ায় ছাপার অক্ষরে দু চার কথা বলার ব-কলমে সুযোগ গেল জুটে। সুযোগ বলতে বাউল-ফকির-তাদের জীবন যাপন-দর্শন-গান নিয়ে নিজের বিজ্ঞতা বা জ্ঞান জাহির করা নয়। সংস্কৃতির সদর বাজারে বাউল-ফকির যখন খুব ‘খাচ্ছে’, বেশ রমরমা, সেই সময়ে, আপাতঃ বাতুনে থাকা বাউল-ফকিরদের ঘিরে বিচ্ছিন্ন ভাবে জুটে যাওয়া কিছু মানুষজনের সঙ্গে বিক্ষিপ্ত যোগাযোগের ভিত্তিতে মদীয় বুদ্ধি-যুক্তি-কল্পনায় জারিত আগামী দিনের সম্ভাব্য এক ধরনের বিপন্নতা বোধ কিংবা অশনি-শনি সংকেত জ্ঞাপনের ভনিতা বলাই ভালো।

‘চাউল’কে চাল বললে বস্তুর কোনো বিকৃতি ঘটে না। কিন্তু সেই সূত্র ধরে আউল বাউলকে না ধরাই ভালো। তাচ্ছিল্য আর অবজ্ঞা ফকির-বাউলের নিত্য সঙ্গী। দুই বঙ্গেই এই সেদিন অবধি তাঁরা সম্মুখীন হয়েছেন বিভিন্ন সামাজিক-ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অত্যাচারের। পরিবর্তন ঘটেছে ঠিকই, কিন্তু এরকম মনে করা ঠিক হবে না সামগ্রিকভাবে তাঁরা খুব ‘জাতে’ উঠেছেন বলে। তবে ভঙ্গ-বঙ্গে বাউল-ফকির ধারার গান-দর্শনের বয়ে চলা-মজা যাওয়া-শাখা-প্রশাখা-পুকুর-ডোবা যে নানান সময়ে বহু প্রান্তিক মানুষের মনোজগতের ঠাঁই তা মেনে নিতে কারোরই অসুবিধা থাকার কথা নয়। কিন্তু নিছক গান হল গিয়ে আলাদা কথা, – তার পরিধি বেড়েছে বই কমেনি। তবে

সে সব হল গিয়ে ‘আরবানি কেতা’ – বাজার-প্রযুক্তির গাঁটছড়ার বৃত্তান্ত। আঁতলামি থেকে মাতলামি সব গোত্রই সেখানে হাজির। ‘আজওবি এক বৈরাগ্য লীলা’য় মাতোয়ারা বর্তমান – আর বাউল-ফকিরের পূর্বভূমিকাকে স্মরণে রেখে ‘উত্তর-উত্তর-আধুনিক মন’ পড়েছে দোলাচলে। ‘ফকির-ফাকরা-আ(উ)ল-বা(উ)ল’ শব্দবন্ধ সেই দোলাচলেরই প্রতীক। শুধু আমার নয়, সম্ভবত অনেকেরই। মানে এই আমরা যারা বাউল ফকির করি আর কি।

– ‘করা’ বলতে – সঙ্গ – চর্চা এবং আরো নানাবিধ বিষয় ও কর্মসূচি, যা কথ্য-অকথ্য এবং লিখিত বিধির ‘করা’ শব্দের অনুযায়ী শহুরে মাথায়-মনে খেলে যাওয়া সম্ভাবনা। আর ‘আমরা’ এই শব্দবন্ধে প্রাথমিক ভাবে কলকাতা ও তার সংস্কৃতির অনুগামী মফস্বল শহরের মানুষজনের কথাই বলছি। তবে এই বাউল-ফকিরদের ঘিরে এই নগর – ‘আমরা’র বাইরেও অনেক ধরনের মানুষ আছেন যাঁরা এই ‘আমরা’ হয়ে উঠবেন কি না এক্ষুনি জোর গলায় বলতে পারছি না। কিন্তু এই দুই বা ততোধিক ‘আমরা’দের মধ্যে কোনো আদান প্রদান বা ‘আমড়াগাছি’ যে একেবারেই নেই সে কথাও বলা চলবে না। তবে তা মূলতঃ মেলা-পার্বণ-মোছব-সাধুসেবা ইত্যাদি ঘিরে। সদর সংস্কৃতির বাণিজ্যিক ফড়ে – যাঁরা বাউল-ফকির ‘আইটেম’কে মদের বারে – ফ্যাশন শো এর র‍্যাম্প-র‍েঁস্তোরায়-অভিজাত ক্লাবে-সুইমিং পুলে পৌঁছে দিচ্ছেন তাঁদের ঘিরে যে ‘আমরা’রা আছেন তাদের পাল্লাও কিছু কম ভারী নয় এখন। আছেন নানান সংগীত শিল্পী ও ব্যান্ড ‘আমরা’ যাঁরা সঙ্গে জড়িয়ে নিচ্ছেন বাউল-ফকিরদের, নিজেদের অভিনব সঙ্গীত চর্চায়। আছেন ‘আমরা’দের পরিচালনায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঘটা কিছু অনুষ্ঠান (যেমন কিনা এই যাদবপুরের বাউল ফকির উৎসবও)।

বাউল-ফকির গানের প্রচার প্রসারে এখন টি ভি চ্যানেল ও অন্যান্য মিডিয়া প্রভূত সক্রিয়। ‘মনের মানুষ’-এর জনপ্রিয় নায়ক ‘বুন্সাদ’র ‘লালন’ হিসেবে চলচ্চিত্রে হাজির হওয়ার কথা তো আলাদা করে উল্লেখ করতেই হবে। চেনা অচেনা মোবাইল ফোন বেজে উঠেছে ভিডির মধ্যে – ‘হুদ মাঝারে রাখব’ বলে। এইসব ঘিরে ক্রমশঃ কিছু বাউল ফকির হয়ে উঠেছেন ‘আইকন’ – বাউল-ফকির গানের ‘ব্র্যান্ড অ্যান্ডাসেসডর’। নগর ‘আমরা’-র ‘ভোলা মন’

এখন ‘গোলেমালে পীরিত’-এ মাথো মাথো হয়ে অনায়াসে এঁদের ধরে ‘সহজ ধারা সঙ্গ কর’ ব্রতে ঢুকে পড়েছেন। এর মাঝে অনেক ‘আমরা’ আবার রব তুলেছেন বাউল-ফকির এঁটো হয়ে গেল বলে। গ্রাম ছাড়া সেই রাঙা মাটির পাথে শুদ্ধ বাউল-ফকিরদের এই (মো) বাউল হয়ে ওঠায় (বাউল-ফকিরদের কাছে মোবাইল থাকাটা খুবই সাধারণ ব্যাপার)। ‘মাধুকরী’ ছেড়ে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের একটু আধটু মুখ দেখায়, বাউল-ফকিরদের বিপথগামী হয়ে ওঠার ব্যাপারে তাঁরা প্রায় নিঃসন্দেহ। তৈরি হয়েছে কিছু তথ্যচিত্র, প্রকাশিত হয়েছে গবেষণাধর্মী বৈশিষ্ট্য বই-প্রবন্ধ। আর কিছু গ্রামভারী আমরা আছেন যাঁরা এই বিষয়টা একটা সাময়িক হুজুক ও ধ্যাষ্টামো বলে ভাবছেন। ‘ফকির-ফাকরা - আ(উ)ল-বা(উ)ল’দের গান আর তাদের নিয়ে ‘আদিখ্যেতা’ কে ধর্তব্যের মধ্যেই আনতে চান না। আগে শহুরে বাবুরা নাকি ‘বাই’ নাচাতো এখন বাউল নাচায়। মোট কথা যে ভাবেই হোক বাউল-ফকির গানের জনপ্রিয়তা বেড়েছে এবং অনেকের কাছে বাউল-ফকিররা যে প্রিয়জন হয়ে উঠেছেন এটা বেশ মালুম হচ্ছে। একদা ‘প্রান্তিক’ সমাজ-সংস্কৃতির, অধুনা ‘মূল’ ধারায় জায়গা পাওয়ার সমীকরণ খুব সরল নয়। এ প্রসঙ্গে ছোট ছোট ‘আমরা’ গোষ্ঠির ভূমিকা ঠিক কি হচ্ছে এক্ষুনি বলা যাচ্ছে না। তবে আমি যে অণু-সঙ্গর কথা বলার চেষ্টা করছি সন্দেহ আছে তাঁরা আদৌ কোনো আমরা-ওয়ার দলে পড়বে কি না। কারণ তাদের দেখতে পাওয়া যাবে না এই ‘আমরা’দের ভিড়ে। নির্জন গভীর পথের শরিক ও তারা নয়। গ্রামগঞ্জে তাদের অকর্মণ্য, গাঁজেল, ন্যালাক্ষ্যাপা, পাগল-ছাগল, মাতাল-চাতাল ইত্যাদি হিসেবে কেউ কেউ চিহ্নিত হয়। দেখেছি এদের প্রতি বাউল-ফকিরদের অদ্ভুত মমত্ব। পাঠকের বাউল-ফকিরদের উৎসব-মেলা-আখড়ায় ঘোরাঘুরির অভ্যাস-অভিজ্ঞতা থাকলে ভিডির মধ্যে অলক্ষ্যে একলা হয়ে থাকা এই মানুষগুলোকে চিনতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

একতারা-তারকাটা

কলকাতায় (হয়তো অন্যত্রও) ‘তারকাটা’ বলে একটা শব্দ বেশ চালু আছে।

একটু ভিন্ন মানসিকতার, খাপছাড়া মানুষ সম্বন্ধে এই জেনেরিক শব্দটির ব্যবহার সত্যিই চমকপ্রদ। অণু-সঙ্গ বলতে যাদের কথা বলছিলাম, তারা কেমন

ধরনের বোঝানোর জন্য ‘তারকাটা’ শব্দটিকেই ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিলাম। ‘তারকাটা’ শব্দটির যে ধ্বনি-দৃশ্য-ভাব-ব্যঞ্জনা তাতে বাউল-ফকিরদের ‘একতারার’ বিষয়টি খানিক প্রাসঙ্গিকও বটে। নানাবিধ তারকাটাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যেটুকু জেনেছি-বুঝেছি তাতে এটা পরিষ্কার যে এদের মানসিক অবস্থা আর অবস্থানের প্রত্যক্ষ ভাবে যেটুকু জেনেছি-বুঝেছি তাতে এটা পরিষ্কার যে এদের মানসিক অবস্থা আর অবস্থানের প্রতি তথাকথিত আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবদের আস্থা বড়ই কম। তাদের জন্য বরং ‘তারকাটা’দের খানিক এড়াতে পারলেই ভাল-‘তারকাটা’দের উপস্থিতি-সঙ্গ সবসময় পীড়াদায়ক না হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অস্বস্তিজনক। নানান ধরনের ‘তারকাটা’দের সঙ্গে বাউল-ফকিরের চাষ: নদীয়া-বীরভূম জেলায় বেশ কিছু আখড়ায়-আশ্রমে মোলাকাত ঘটেছে। শুধু বীরভূম-নদীয়া কেন সারা বাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন দরোগা-পীঠে ‘পাগল’ ভাল করার প্রসিদ্ধি সম্বন্ধে অনেকেই জ্ঞাত। তবে ‘তারকাটা’দের তো পুরোপুরি মানসিক ভাবে ভারসাম্যহীন বলা যাবে না, আর বাউল-ফকিরদের আখড়া মাঝেই ‘পাগল’ ভাল করার ঠিকাদারি নিয়ে বসে নেই। দ্বিতীয়ত ‘তারকাটা’দের বাড়ির লোকেরা বাউল-ফকিরদের আখড়ায় নিয়ে আসে না, নিজেরাই কি করে যেন এসে হাজির হয়।

কেন যে তারা হাজির হয় – এই প্রশ্নে বলা যেতে পারে ‘তারকাটা’দের নিজের জন্য যে পরিসর প্রয়োজন তা এখানে তারা খুঁজে পায়। বাউল-ফকিরদের ‘একতারার’ সুর-তালে ‘এই দেহ ভাঙারের’-খোদাকে বন্দি করার চেষ্টাই হোক – ‘খাঁচার ভিতর অচিন পাখি’র সন্ধানী হোক বা ‘মানুষ ভজা’র সাধনাই হোক – গান ঘিরে, গাঁজার ধোঁয়ায় আবিস্ট হয়ে ‘তারকাটা’দের মনের মধ্যে নিজস্ব সন্ধান প্রক্রিয়া চলে বলেই আমার ধারণা। – মনের উপর সঙ্গীতের প্রভাব ঠিক কি ভাবে ছাপ ফেলে জানা না গেলেও তবে ছাপ যে ফেলে সে কথা আশাকরি সবাই মেনে নেবেন। নিত্যদিন ‘মহাজনের বাণী’ নির্ভর গানের আসরে উপস্থিত থেকে হয়তো বা নিজেদের কেটে যাওয়া তার জুড়তে, মানানসই সুরে তার বাঁধতে সচেষ্ট হয়ে পড়ে, অজান্তে তারা ঢুকে পড়ে নিজের ‘মতি’ পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় – এই ভাবেই তৈরি হয়ে ওঠে বাউল-ফকিরদের কেন্দ্র করে ‘তারকাটা’দের পরিসর। সেখানে

তারা অপাঙক্তেয় নয়। সেখানে তাদের উপস্থিতি কাউকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলে না। নিজেদের রিপুতাড়িত-সঙ্কিত-অনুশোচনা ক্লিষ্ট গুটিয়ে থাকা বন্দি মন কিছুটা খোলস ছেড়ে বেরোতে পারে। বাউল-ফকিররা সেটা বোঝেন এবং প্রশ্রয় দেন বলেই গড়ে ওঠে পরিসর, দৃশ্যমান হয় তাদের আচারের ব্যবহারের মমত্ব। মনস্তত্ত্বের জটিল পাঠের বিস্তারে না গিয়েও ‘দস্যু রত্নাকরের’ বাল্মীকিতে রূপান্তরের যে জনশ্রুতি বা কাহিনি চলে আসছে বিগত পাঁচশো বা তারো বেশি সময় ধরে তার মধ্যে যে কোনো বিশ্বাসযোগ্যতা নেই এ কথা বলা যাবে না। বিশ্বাসযোগ্যতা বলতে ঐতিহাসিক সত্যতা নয়, মনস্তাত্ত্বিক সম্ভাবনার কথা বলছি। ম-রা-ম-রা উচ্চারণ ক্রমশ রা-ম-রা-ম হয়ে অনুশোচনায় জর্জরিত যে মনের মুক্তি, বাউল বা ফকির গানের আন্তরিক উচ্চারণে একান্ত হলে মনে যে সেরকম প্রভাব ফেলে না কে বলতে পারে?

একাধিক ডাকসাইটে দুরন্ত মানুষ (ছিলেন এবং এখনও আছেন) – দাঙ্গা-খুন-লুটপাট-এমনকি ধর্ষণের অভিযুক্ত (রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক দুটি স্তরে বিচ্ছিন্ন বা যুক্তভাবে)। পরবর্তীকালে তারা সন্তুপ্রতিম না হলেও গৌসাই-গুরু, পীর-ফকির হিসেবে সম্মান ও মর্যাদা আদায় করে নিয়েছেন – এই বঙ্গে যে রকম উদাহরণ খুব একটা বিরল নয়। স্বভাবতই সে সব মানুষের বিষয়ে ভাল-মন্দ দুই রকমই রটনাই চলে। কিন্তু তার জন্য ‘তারকাটা’দের পরিসর গড়ে ওঠা বিঘ্নিত হয় না। – অসামাজিক-অপরাধী মনের পরিচয় পাওয়া যায় কোনো পাপা-অন্যায় ঘটে যাওয়ার পর। যে সব ঘটনা জুড়ে জুড়ে সমাজের মধ্যে সুস্থ স্বাভাবিক মনের পাশাপাশি অসুস্থ-অস্বাভাবিক মানসিকতার উপস্থিতির আন্দাজ পাওয়া খুব কঠিন নয়।

‘তারকাটা’দের মধ্যে অনেকের এই ধর্ম বা গুণ কখনো প্রকট – কখনো অস্তঃসলিলা। অনেকের কাছে তাই এরকম মনে হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। ‘ফকির-ফাকরা-আ (উ)ল-বা(উ)ল’ হল শাস্তি (রাষ্ট্রীয় ও সমাজ) এড়াতে ভেক ধরার কল। জেলখানার অধুনা নাম হয়েছে সংশোধনাগার। পরিবার-সমাজ এবং কিছুটা হলেও রাষ্ট্র দ্বারা যে সব মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় প্রায়ই অজান্তে বাউল-ফকিররা তাদের গান নিয়ে আছেন বলে সেই সংশোধন প্রক্রিয়ার মধ্যে এরা কেউ কেউ সামিল হয়। কে বলতে পারে হয়তো অনেকের অপরাধ-পাপ প্রবৃত্তি খানিক হলেও দমিয়ে রেখে সার্বিকভাবে সমাজের সুস্থতা

কিছুটা বজায় রাখতে সহায় হয় না। জাত-ধর্ম-পরিবারের অবস্থা নিরপেক্ষভাবে, বিশেষ করে মানবিকতা-নৈতিকতা গড়ে তোলে এমন প্রতিষ্ঠান – মাধ্যম – মানুষ গ্রামে বাউল – ফকির-রা ছাড়া কোথায়?

তবে যে সব হল গিয়ে ‘সেই সময়’ এর কথা যখন কিনা ‘গ্রাম ছাড়া এই রাঙা মাটির পথ-’। এখন তো গ্রাম আর সেই গ্রামটি নেই। তার চালচিত্র যে ভাবে পাল্টেছে, অর্থনীতি-রাজনীতি-রুচি-সংস্কৃতি সব কিছুই, এখন ‘প্রান্ত’ আর ‘কেন্দ্র’ও সবসময়ে পরিষ্কারভাবে আলাদা নয়। স্বাভাবিক ভাবে গ্রামীণ সমাজ ও বাউল-ফকিরদের পারস্পরিক যোগসূত্রের সমীকরণে ঘটেছে নানান রদবদল। মহাজনের পদের বিকৃতি হয়তো ঘটছে না, তবে সাধকের থেকে গায়কের প্রতিপত্তি হয়ে উঠেছে বেশি। কালচারাল আইকন হয়ে ওঠা বাউল বা ফকিররা সবসময় ‘তারকাটা’দের অভীষ্ট পরিসরের সহায়ক নন। এইভাবে তারকাটা যদি এক ধরনের মানসিক ‘সিনড্রোম’ হিসেবে বলা যায়, তারাও হাজির হচ্ছেন বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক-ভৌগোলিক অবস্থান থেকে। কালচারাল আইকন ও সাংস্কৃতিক পণ্য হিসেবে বাউল-ফকির ও তাদের গান যখন প্রকট, পূর্বোক্ত আমরারা যখন ব্যক্তি বা সমষ্টিগত ভাবে হয়ে উঠেছেন স্বঘোষিত বাউল-ফকিরদের পৃষ্ঠপোষক, তখন গ্রামীণ পরিবেশে বাউল-ফকিরদের আখড়ার চরিত্র তার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারছে না। কেউ ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন বাউল বা ফকিরদের নেশামুক্ত করতে, কেউ হাজির হচ্ছেন শুদ্ধ বাউল গান শেখাতে, কেউ কেউ চালু করার চেষ্টায় আছেন ট্র্যাডিশনের নামে নূতন ভাবে গায়নরীতি। এই সবার ভালমন্দ পরে সময়ই বলবে কিন্তু -- ‘তারকাটা’দের পরিসর যে বিদ্বিত হতে শুরু করেছে তার আভাস বিস্তর মিলেছে। তবে একটাই ভরসার কথা, অনেক বাউল-ফকিরই মনে করেন -- আমাদের ‘লালন’কে ওরা (অর্থাৎ এই লেখায় যারা ‘আমরা’) মারতে পারবে না। লালন হল গিয়ে ‘নাইলন’ -- ও যতই টানা-টানি হোক ছিঁড়তে পারা যাবে না।

দু-চার কথার মোদ্দা কথা

আগেই বলেছি এই লেখা অশণি-শণি সংকেতের ভণিতা মাত্র। সংকেত বলেই চাঁচাছোলা ভাষায় না বলে আভাসে ইঙ্গিতে ব্যক্ত করেছি। মোদ্দাকথা বাউল-ফকিরদের ঘিরে অধুনা ‘সহজধারা সঙ্গ’ করার ঠেলায় অনেক সময়

‘আমরা’দের আগ্রাসনের তারকাটার পাশাপাশি আরো অনেক সাধারণ মানুষ আছেন তাঁদের পরিসর যাচ্ছে কমে। ‘সাধুর চরণধূলি গায়ে লাগার’ অবকাশ এবং সাধুত্বের বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় organic culture এর পরিবেশ হচ্ছে বিদ্বিত। তাই ‘আমরা’দের প্রতি বার্তা, আলোচিত দিক ও বিষয়গুলি নিয়ে আর একটু সচেতন-সতর্ক হন, প্রয়োজন কিঞ্চিৎ সংযমেরও। ‘বিবিধ আমরা’র বাউল-ফকিরদের নিয়ে এই ‘সহজ ধরা সঙ্গ’ হোক এই আর্জি।

পরিশেষে

না ঘর কা, না ঘাট কা অবস্থানের সঠিক ভেদাভেদ ঠিক জানি না। জানি না আড়ালে আমাকেও ‘তারকাটা’ বলা হয় কিনা – না কি বিভিন্ন ‘আমরা’র সক্রিয় সদস্য হয়ে উঠছি। ব্যক্তিপরিচয় মনে হয় কিছুদিন আড়ালেই থাক। নিজের ভূমিক ঠিক করা বা বিপন্নতা বোধ থেকে মুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়াটা চালু করাই এখন Real Challenge। ‘মন যা চায় তা ত্বরায় করো এই ভবে’ ঠিক করে লেখক সত্ত্বাকে R.C. নাগর হিসেবেই ঘোষণা করলাম।

স্বসুখ হ'তো স্ব-সুখধাম, শক্তিগুরু কামে অকাম,
উজ্জ্বল রস তাহারি নাম,
অনঙ্গ তার ধীর হয়েছে।।
শ্রীরূপ দেখবি যদি মন-বিবাদী
ত্রিবেণীর ওপারে চল।
ঘাটের উপরে আছে হাটের মাঝে
শ্রীরূপের এক রংমহল।

কুড়ি বছর পরে, এগারো মাইল

[রুচির জোশি কলকাতার ছেলে। ১৯৯০ সালে বাউলদের নিয়ে একটি তথ্যচিত্র তৈরি করেছিলেন, নাম ইলোভেন মাইলস (এগারো মাইল), ১৯৯১ সালে প্যারিসে আন্তর্জাতিক তথ্যচিত্র উৎসব সিনেমা দ্যু রিয়েল এ ছবিটি আমন্ত্রণ পায় এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে জোরিস ইভান্স পুরস্কার পায়। সেই ছবির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন সুরজিৎ সেন। কুড়ি বছর পরে তাঁরা সেই ছবিটি নিয়ে কথা বলেছেন। রুচির বাংলা ভাষায় খুব স্বচ্ছন্দ নন।

তাই অনেক কথা ইংরেজিতে বলেছেন, সেগুলো ইংরেজিতেই রাখা হয়েছে, আশা করি পাঠক এই কষ্টটুকু স্বীকার করবেন। – সম্পাদক]

সুরজিৎ : দীপকদা (মজুমদার) বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে একটি অফিসে বসতেন। সেখানে আমি প্রথম তোমাকে দেখি।

রুচির : হ্যাঁ, ওটা ছিল রূপা (মেহতা)দের (যাদের ফ্রি স্ট্রিটে সা/শা নামে হ্যান্ডিক্রাফটসের দোকান আছে)। বাড়ির গ্যারেজ। রূপা তো দীপকদার ছাত্রীও ছিল, মিডিয়া স্টাডিজ কোর্সে, চিত্রবাণীতে।

সুরজিৎ : ওই অফিস থেকে উনি মুভক্রাফট নামে কাগজটা এডিট করতেন। ওখানে আমি প্রায়ই যেতাম।

রুচির : কাগজটা তো সা/শা/রই একটা মুখপত্র ছিল। কয়েকটা ইস্যুতে আমিও ডিজাইন করেছি। ওখানে কী করতে যেতে?

সুরজিৎ : খুব যে কিছু একটা করতে যেতাম তা নয়। তবে গেলেই কিছু কিছু না কিছু গজিয়ে উঠত। দীপকদা আমাকে দিয়ে বিভিন্ন

টেক্সট থেকে কিছু অনুবাদ করিয়ে ছিলেন, ইংরেজি থেকে বাংলা, ওই কাগজের জন্য। সেখানেই একদিন তুমি গিয়েছিলে, আমিও ছিলাম, তোমার সঙ্গে একটা ক্যামেরা ছিল....

রুচির : আমার অলিম্পাস ক্যামেরা

সুরজিৎ : তুমি তোমার তোলা কিছু ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ছবি নিয়ে এসেছিলে ওনাকে দেখাতে। সেদিন দীপকদা আমাদের আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। তোমরা তারপরের দিন মেদিনপুরের নয়াগ্রামে দুখুশ্যাম চিত্রকরের বাড়িতে যাবে সেই নিয়ে কথা হচ্ছিল। সালটা আমার মনে নেই।

রুচির : ১৯৮৬।

সুরজিৎ : তোমার সঙ্গে দীপকদার আলাপ কী ভাবে হলো?

রুচির : আমি আজমিরে মেয়ো কলেজে স্কুলে পড়েছি, বোর্ডিং এ থাকতাম। ১৯৭৭ সালে স্কুল শেষ করে কলকাতায় এলাম। তখন এমাজেসি উঠে গেছে, সেন্ট্রাল এ জনতা সরকার, এখানে লেফট ফ্রন্ট, চারপাশে বেশ একটা হাসিখুশি ভাব। প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়েছি কিন্তু ক্লাস শুরু হতে দেরি। কিছু করার নেই, বাবার একটা নিকন এফ ক্যামেরা ছিল সেটা নিয়ে ছবি তুলে বেড়াইতাম। তো ক্যামেরাটা খারাপ হয়ে গেছিল। কেউ একজন আমাকে বলল যে, তুমি লতিফের কাছে যাও, কলকাতায় হি ইজ দ্য বেস্ট। লতিফের দোকান ছিল অস্টিন ডিস্ট্রিবিউটার্সের অফিসের পিছনে, আই টি সি অফিসের পাশে। ওই একটা কোর্ট ইয়ার্ডের মতো জায়গা, যেখানে গ্যারেজ আছে, গুমটি দোকান আছে, লোকে থাকেও। তখন কলকাতায় এরকম স্পেস ছিল। যাই হোক, ক্যামেরাটা দিয়ে এলাম। যেদিন আনতে গেলাম সেদিন একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল, আমার থেকে বয়সে কয়েক বছরের বড়, সেও ক্যামেরা সারাতে এসেছে। তার নাম মুনমুন সেন। আমি তো জানি না কে মুনমুন সেন, অনেক পরে জেনেছি। যাই হোক, কথায় কথায় মেয়েটি

বলল, ইফ ইউ আর ইন্টারেস্টেড ইন ফটোগ্রাফি, ইউ শ্যুড গো টু চিত্রবাণী। দে আর রানিং আ মিডিয়া কোর্স। চিত্রবাণীতে আমার যাওয়া আসা ছিল, কারণ আমার বন্ধু আনন্দ লালের বাবা পি. লাল তখন ওনার করা মহাভারতের ট্র্যান্সলেশনটা ওদের সাউন্ড স্টুডিওতে রেকর্ড করতেন, আমিও আনন্দের সঙ্গে একবার দু'বার গেছি। দেন শি সেড, মানে মুনমুন, দেয়ার ইজ আ ম্যান কন্ড দীপকদা, মিট হিম। তো আমি গেলাম রফি আহমেদ কিদোয়াই রোডে। এখন চিত্রবাণীর বিল্ডিংটা অন্যরকম হয়েছে।

সুরজিৎ : আগে গেট দিয়ে ঢুকে ডানদিকে চার্চ আর বাঁদিকে চিত্রবাণীর বিল্ডিং ছিল। ওদের লাইব্রেরিতে আমি বহুদিন গেছি।

রুচির : হ্যাঁ, সেখানে ডিপ্লোমা ইন মিডিয়া স্টাডিজ কোর্সে ভর্তি হব বলে গেলাম। দোতলায় একদিকে সাউন্ড স্টুডিও, বাইরে একটা ছোটো অঙ্ককার ঘরে কালো রোগা করে একজন বসে আছে। আমি ঘরে ঢুকতেই উনি বললেন, ইয়েস। এরকম একটা ব্যারিটোন ভয়েস শুনে বেশ চমকে গেলাম। আমি বললাম, মাই নেম ইজ রুচির জোশি। উনি বললেন, হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট। বললাম, আই হ্যাভ কাম ফর মিডিয়া কোর্স। উনি বললেন, মিডিয়া কোর্স? সিট ডাউন। হোয়াট ডু ইউ নো অ্যাবাউট মিডিয়া? হোয়াট আর দ্য মেজর মিডিয়া? আমি ভাবছি, কিরে বাবা, একটা ছোটোখাটো লোক এরকম একটা গলায় বেশ বসের মতো একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছে। আমি বললাম, নিউজ পেপার, প্রেস ফিল্ম, টেলিভিশন... তখন আরও জোরে বলে উঠলেন, রেডিও? রেডিও ইজ নট আ মেজর মিডিয়া অফ দি কান্ট্রি? আমি বললাম, হ্যাঁ, হ্যাঁ, রেডিও রেডিও। ওই ভয় দেখিয়ে দিল আর বুঝিয়ে দিল হু ইজ দ্য বস। এরপর কিছু ফর্মালিটি ছিল ভর্তি হওয়ার সেগুলো করে আমি দীপকদার ছাত্র হয়ে গেলাম। এই ভাবে দীপকদার সঙ্গে আলাপ, ১৯৭৭ সালে সেটা।

সুরজিৎ : তো মিডিয়া স্টাডিজ শুরু হল?

রুচির : হ্যাঁ, আমি চিত্রবাণীতে পড়ছি আর প্রেসিডেন্সিতে ইংলিশ লিটারেচার পড়ছি, এদিকে মনে মনে ইচ্ছে ফিল্ম মেকার হব। ফ্রেঞ্চ ফিল্ম মেকারদের স্পেশালি গোদার, ব্রুফোঁ এদের ছবি খুব ভাল লাগতো। এখানে সত্যজিৎ দেখেছি, ঋত্বিক ঘটকের নাম শুনেছি সব, ছবি দেখিনি আর শ্যাম বেনেগাল দেখেছি। চিত্রবাণীতে আলাপ হল শিবা চাচি, গৌতম চ্যাটার্জির সঙ্গে। এইসময় আমেরিকান ডকুমেন্টারি ফিল্ম মেকার নিক ম্যানিং, যে নিউ ইয়র্কের ব্রুকলিনের প্র্যাট ইন্সটিটিউটে ডকুমেন্টারি ফিল্ম তৈরি শেখাত। সে পুণেতে এসেছিল। চিত্রবাণীর ফাদার রোবের্জ তাঁকে কলকাতায় আনে আমাদের ওয়ার্কশপে নেবার জন্য। নিকের সঙ্গে ছিল পুরোনো অ্যারি ক্যামেরা আর ১৬ মিমিঃ ফিল্ম। ও আমাদের লেকচার দিল, ছবি দেখাল, কিন্তু ওর বক্তব্য ছিল, বেশি কথা বলে লাভ নেই, লেটস ডু ইট। ও বলল, আমার কাছে ক্যামেরা আছে, অল্প ফিল্ম আছে, আমরা কলকাতায় সারাদিনের একটা শুট করি। আমি ফিরে গিয়ে ফিল্মটা প্রসেস করে তোমাদের একটা প্রিন্ট পাঠাব। তো একদিন সকালে আমার বাবার গাড়িতে আমি, গৌতমদা, শেখর দাস আর নিক আমরা সারাদিন কলকাতায় শুট করলাম, কুমারটুলি, কফি হাউস আর ভিক্টোরিয়া। সবাই ক্যামেরা চালান, আমরা সেদিন প্রথম মুভি ক্যামেরা হাতে নিলাম এবং ছবি তুললাম। আমি ওই ফিল্ম রোলিং এর ক্রি....র....র, আওয়াজে এত থ্রিলড হয়েছিলাম যে কী বলব। তখনকার পুরোনো রোলেক্স, অ্যারি বা বোলিও ক্যামেরাতে এই আওয়াজটা হত। শুটের পরে নিকের সঙ্গে আড্ডা দেবার সময় ও বলল, ফিল্ম স্কুলে পড়ে ফিল্ম বানানো শিখতে অনেক দেরি হবে। যদি ডকুমেন্টারি বানাতে চাও, বেগ, বরো ওর স্টিল দ্য মানি এন্ড জাম্প ইন টু ইট। এটা আমার জীবনে সেরা উপদেশগুলোর একটা। যে জাস্ট নেমে পড়ো, ঝাঁপিয়ে পড়ো।

সুরজিৎ : আর বাউলদের সঙ্গে কী ভাবে দেখা হল?

রুচির : ইয়েস বাউল, ইতিমধ্যে আমি দেখেছি দীপকদা চিত্রবাণীতে বাউলদের নিয়ে কাজ করছে আর সেলিম পাল ছবি তুলছে।

সুরজিৎ : কী কাজ করছে?

রুচির : অত মন দিয়ে দেখিনি কী করছে। ওই রুরাল কমিউনিকেশন ...এটসেটরা। আমার কোনও ইন্টারেস্ট ছিল না। শহরের ছেলে, শহর ভালবাসি। গ্রাম নিয়ে আমার কোনও ইন্টারেস্ট নেই। গ্রামে কোনদিন যাইনি। হঠাৎ একদিন দীপকদা বললেন, আমরা দীনবন্ধু বাউলের বাড়ি যাচ্ছি। তুমি কি যাবে?

সুরজিৎ : মানে হাওড়ায়।

রুচির : হ্যাঁ, আমি রাজি হয়ে গেলাম। হাওড়া স্টেশনের পিছনে বাস টার্মিনাস থেকে বিকেল চারটের সময় আমরা বাস ধরলাম আর রাত আটটায় পৌঁছোলাম। আমরা মানে, আমি, দীপকদা, মেয়েদের মধ্যে রূপা আর শিবা, গৌতম চ্যাটার্জী, শেখর দাস আর কারা ছিল মনে নেই। বাস থেকে নেমে দেখলাম, আমাদের জন্য লোক দাঁড়িয়ে আছে। আমরা সঙ্গে করে চাল, ডাল নিয়ে যাচ্ছি। আমি ভাবছি গ্রামে আমরা কেন চাল, ডাল নিয়ে যাচ্ছি? ওখানেই তো ওগুলো চাষ হয়। দীপকদা বললেন, তুমি এসব বুঝবে না। আমরা এতগুলো লোক যাচ্ছি ওদের বাড়িতে, থাকব, খাব, তাই ওখানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেটা আমার প্রথম চটি পায়ে গ্রামের আলপথ ধরে হাঁটা। খুব ঠান্ডা। ইট ওয়াজ জানুয়ারি, সেভেনটি এইট। সামনে একজন হাজাক জেলে নিয়ে হাঁটছে, পিছনে আমরা। চাঁদের আলোও আছে। আমি বেশ কয়েকবার হোঁচট খেলাম, একবার প্রায় পড়ে যাচ্ছিলাম। অনেকটা হেঁটে পৌঁছলাম দীনবন্ধুর বাড়ি। উনি আর ওনার স্ত্রী আমাদের যে কী আদর করে বসাল। আমি তো ওভারহোয়েলমড। যে আমাকে চেন না তুমি এত প্রেম কী করে দেখাচ্ছ?

সুরজিৎ : ওনাদের ছেলে গোষ্ঠগোপাল গান গেয়ে বেশ নাম করেছিল। গোষ্ঠর গান কমার্শিয়াল হিট করেছিল, রেকর্ড, ক্যাসেট সব ছিল।

রুচির : হ্যাঁ শুনেছি। এনি ওয়ে, রূপা আজও কথা উঠলে বলে যে, রুচির গ্রামে গিয়ে ছুটফট করছে কখন বাড়ি যাবে। এত অসুবিধের মধ্যে পড়েছে। ঠিকই। আমি ভাবছি এখানে থাকব কী করে? ইলেকট্রিসিটি নেই, টয়লেট নেই। উঠোনে আসন পেতে বসেছি। কথাবার্তার মধ্যে গাঁজার কঙ্কে হাতে হাতে ঘুরতে শুরু করল, রামের বোতলও খোলা হল, এবার গান শুরু হল। সেই প্রথম বাউল গান শুনলাম। তারপর রাতটা কোনরকম কাটিয়ে আমি ভোরবেলা বাড়ি আসব। বাকিরা বলছে আমরা তো দু-তিন দিন পরে যাব। আমি বললাম, দু-তিন দিন! নো ওয়ে। আর আমি ওসব মাঠে পায়খানা করতে পারব না। মানে তখন আমি ভাবতেই পারি না। পরে ইলেভেন মাইলসের সময় ওসব আমরা করেছি। তুমি তো জানো। এবার সবাই আমাকে নিয়ে হাসাহাসি শুরু করল। আমি তখন পালাতে পারলে বাঁচি। শিবাও খুব হাসছে, ও শহরের মেয়ে হলেও প্রচুর গ্রামে থেকেছে, আর দীপকদা এটা নোট করে খুব খুশি, যে, রুচির তুমি এটা নিতে পারলে না। শেষে বেলা বারটার সময় আমি ফিরে এলাম। এই হল বাউলের সঙ্গে আমার প্রথম এককাউন্টার।

সুরজিৎ : তারপর তুমি বোধহয় বিদেশে চলে যাও।

রুচির : আমি তখন প্রেসিডেন্সিতে ইংলিশ লিটারেচার পড়ে বোর হয়ে গেছি। মানে বুঝতে পারছি এখানে বেশিদিন পড়লে আমার ইংরেজি সাহিত্যের প্রেমটা উবে যাবে। আর লেফট ফ্রন্ট পাওয়ারে এসেছে বটে, কিন্তু ওই সময় কয়েক মাস বন্ধে ঘুরে এসে বুঝলাম, কোলকাতা ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে। এর মাঝে আমি আমেরিকার একটি কলেজ থেকে স্কলারশিপ পেলাম। ফিল্ম মেকিং শিখব। এটার নাম গডার্ড কলেজ। ছোটো একটা

কাউন্টার কালচারাল কলেজ। ভারমন্টে। নিউ ইয়র্কের নর্থ, খুব ঠান্ডা ওখানে।

সুরজিৎ : ওখানে তো কবি রবার্ট ফ্রস্ট থাকতেন।

রুচির : রাইট। নভেলিস্ট সলমোনেতসিন যখন রাশিয়া থেকে পালিয়ে আমেরিকায় আসেন, তখন উনিও ভারমন্টে থাকতেন। আমি ওখানে তিন বছর ছিলাম। মাঝে একবার কলকাতায় এসে দুমাস ছিলাম। তখন আবার দীপকদার সঙ্গে দেখা হয়। বসুধা জোশির সঙ্গে আলাপ হয়, পরজয় গুহ ঠাকুরতার সঙ্গে আলাপ হয়। শিবা চাচি তখন দিল্লি ফিরে গেছে। গৌতমদা 'মহিনের ঘোড়াগুলি'র গান নিয়ে ব্যস্ত। বিবেক বেনেগাল, শ্যামের ভাইপো, আমাদের সঙ্গে মিডিয়া স্টাডিজ পড়তো, ও ডাক্তারি পড়তে চলে গেছে।

সুরজিৎ : দীপকদা তখন কি চিত্রবাণীতেই?

রুচির : হ্যাঁ। আমেরিকায় ফিরে যাবার আগে একদিন দেখা করতে গেছি ওনার সঙ্গে। দেখি, দুটো গ্রামের ছেলে ওখানে বসে। একটু অদ্ভুত দুজনই। একজনের চুল জিমি হেড্রিকসের মতো। আর একজনের কোঁকড়া চুল, দুজনই খুব মিষ্টি দেখতে, একজন বেশি কালো। বেঁটে, পাতলা, রোগা কিন্তু খুব বিউটিফুল। ওরা দাঁড়িয়ে আছে, দীপকদার সঙ্গে কথা বলছে। আমি ঘরে ঢুকলাম, দীপকদা বললেন, আরে এসো এসো আলাপ করিয়ে দিই। ওদের বললেন, ও হলো আমার ছাত্র রুচির আর আমাকে বললেন, এ হলো পবনদাস আর এ হলো গৌর ক্ষেপা। দে আর ফ্যান্টাস্টিক বাউল সিংগারস। আলাপ হলো ওদের সঙ্গে। ততদিনে আমি ইন্টারেস্টেড ইন বাউল। আমি বাউলদের নিয়ে সেলিম পালের ছবি (স্টিলস) দেখেছি, দীপকদার সঙ্গে বাউলদের নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। আমেরিকায় গিয়ে আমার নিজের দেশের বাস্তবতা নিয়ে আমার উৎসাহ বাড়লো। ওয়েস্টে গিয়ে ওয়েস্টটা দেখার পর আমার মনে হলো নিজের রুটটা কী সেটা জানা দরকার। দীপকদার কাছে শুনি, যে, জর্জ লুনো বলে একজন ফ্রেঞ্চ ফিল্ম

মেকার এসে বাউলদের ওপর একটা ফিল্ম করে গেছে। এই ওদের সঙ্গে আলাপ হলো। আমি চলে গেলাম আমেরিকায়।

সুরজিৎ : তুমি কেতন মেহতার ছবিতে কাজ করেছিলে না?

রুচির : ঠিক। বলছি সেটা। ওখানে কোর্সটা শেষ হবার পর এক বছর নিউ ইয়র্কে ছিলাম। এই ওয়েটার আর সব ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে কাজ টাজ করে চালাতাম। তারপর শুনলাম কেতন মেহতা একটা ফিচার ফিল্ম করছে নাম 'হোলি'। আমাদের একটা খুব দূরের পারিবারিক যোগাযোগ ছিল। যাই হোক, আমি ঠিক করি কেতনকে অ্যাসিস্ট করব। বিদেশ থেকে ফিরে আমেদাবাদে কিছুদিন ওর সঙ্গে কাজ করলাম, এরপর ওর ছবিটা বন্ধ হয়ে যায়। আমি কলকাতায় ফিরে আসি। পরে কেতন ছবিটা শেষ করে। সেটা ১৯৮৩। দীপকদা সুইজারল্যান্ডে একটা থিয়েটার গ্রুপের সঙ্গে ওয়ার্কশপ করেছিলেন। যাদের সঙ্গে দীপকদা ওখানে কাজ করেছেন, সেই থিয়েটারের ব্রুনো বলে একটা ছেলে, লম্বা, রোগা, অভিনেতা। ও এসেছে কলকাতায়। দীপকদা ওকে চেনে, বাউলরাও চেনে। একই ভাবে দীপকদা বলছে, যেমন দীনবন্ধুর বাড়ি যাবার বেলায় বলেছিল, আমরা পাথরচাপুরির মেলায় যাব। তুমি যাবে? আমি বললাম, যাব। আমরা মানে আমি, বিবেক, ব্রুনো আর দীপকদা। আর যাবার সময় গৌরকে বোলপুর থেকে তুলে নেব। আমরা গেলাম প্রথম গৌরের বাড়ি। সেখানে গৌর আর ওর বউ হরির সঙ্গে আলাপ হয় আর ওদের সঙ্গে রামানন্দ ছিল। সেখানে আমার রামানন্দের সঙ্গে প্রথম আলাপ। সেই প্রথম আমি সামনে বসে গৌরের গান শুনি। আর আমার চোখটা খুলে যায়। গৌরের গান রেকর্ডিঙে শোনা, ছবিতে দেখা আর সামনে বসে শোনা এবং দেখাও। ইউ ওয়াজ আ ম্যাজিক। সেই ঘোরটা কাটতে সময় লেগেছিল। তারপর আমরা বাসের মাথায় চেপে পাথরচাপুরি গেলাম। ওই মেলায় আমি প্রচুল স্টিলস তুলেছিলাম। বাউল - ফকির - খাবার - মানুষ। দুদিন আমরা ওখানে থেকে ফিরে এলাম।

সুরজিৎ : এখন আমার মনে পড়ছে, দীপকদা তখন 'দেশ' পত্রিকায় ছুটি নামে একটি কলাম লিখতেন। এই ট্রিপটা নিয়ে একটা কলাম লিখেছিলেন।

রুচির : হ্যাঁ, দীপকদা আমাকেও বলেছিলেন, কিন্তু আমি তো বাংলা পড়তে পারি না। পাথরচাপুরি থেকে ফিরে এসে একদিন অলিম্পিয়া বারে পবন আর মিমলু (সেন)র সঙ্গে দীপকদা আলাপ করিয়ে দিলেন। মানে পবনের সঙ্গে আগেই আলাপ ছিল, মিমলুর সঙ্গে আলাপ হলো। তারপর থেকে মাঝে মাঝেই গৌর, পবন আর মিমলুর সঙ্গে দেখা হয়। দীপকদা কখনো ওই গ্যাদারিংগুলোয় আছে বা নেই। এরপর পবন আর মিমলু প্যারিস চলে গেল।

সুরজিৎ : কখন তোমার মনে হলো যে এদের নিয়ে একটা ছবি করবে?

রুচির : আমি পুরোনো নিউ মার্কেট (পুড়ে যাবার আগে) নিয়ে একটা ফিল্ম করেছিলাম। ১৬ মিমিঃ তে। দীপকদা সেই ছবিটার ক্রিটিক করলেও খুব সাপোর্টিভ ছিলেন। ওই ছবিটা খুব কিছু হয়নি। এখানে শর্ট ফিল্ম ফেসটিভ্যালে সিলেকশনের জন্য দিলাম আদুর গোপালকৃষ্ণন জুরি ছিলেন, উনি রিজেক্ট করলেন। বললেন, এই ছবিতে মিউজিকের ব্যবহার ঠিক হয়নি। আমার বেশ রাগ হলো।

সুরজিৎ : তুমি তারপর কী করছিলে?

রুচির : ওই চিত্রবাণীতে ইউ জি সি-র ছোটো ছোটো ছবি করতাম লো ব্যান্ড ইউম্যাটিকে। এই সময় আলাপ হয় সিনেমাটোগ্রাফার সম্বিত বসুর সঙ্গে। সে একদিন আলপ করিয়ে দিল মহাদেব শী নামে এক এডিটরের সঙ্গে যে এফ টি আই আই থেকে পাস করে এসেছে। তো ওর সঙ্গে আমি একটা ইউ জি সি'র ছবি করলাম। আমাদের বেশ ভাল টিউনিং হলো। ভাল এডিটর আর ভাল ছেলে। তাড়াতাড়িই বন্ধুত্ব হয়ে গেল। এদিকে রঞ্জন পালিতের সঙ্গে আলাপ হলো। রঞ্জনের তখন বেশ নাম। ও এফ টি আই আই থেকে পাস করে আনন্দ পটবর্ধনের 'হামারা

শহর বোম্বাই' শ্যুট করে বেশ নাম করেছে। আর আমি ইউ জি সি-র ছবি করি। আমার রঞ্জনকে বলার সাহস নেই কি তুমি আমার জন্য শ্যুট করবে? ও তখন বসুধার (জোশি) সঙ্গে থাকছে, বসুধা আমার বন্ধু। আমি রঞ্জনকে বললাম যে আমার খুব কম বাজেট, আমি তোমাকে কী করে শ্যুট করতে বলব? ওই ইউ জি সি-র ছবির জন্য। ও বলল যে, ফাইন, টাকাটা সবসময় ফ্যান্টার নয়। আমি তোমার জন্য শ্যুট করব।

সুরজিৎ : তখন এই করেই চালাচ্ছিলে?

রুচির : ঐ টেলিগ্রাফ কাগজে মাঝে মাঝে লিখতাম, কোনও স্টিল ফটোগ্রাফির কাজ পেলে করতাম আর ইউ জি সি-র ছবি। বাবা থাকতে খেতে দিচ্ছে আর একটু সাপোর্ট করছে। কোনও কাজ নেই। বাবা মায়ের বন্ধুরা বলছে তোমার ছেলে কী করবে? ওর তো কিছু হবে না। আমাকে বম্বেতে অ্যাড ফার্মে কাজ করে দেওয়ার চেষ্টা করছেন তাঁরা। কিন্তু আমি তো হব আর্টিস্ট, ফিল্ম মেকার। রয়ে গেলাম এখানে। তো রঞ্জনের সঙ্গে ইউ জি সি-র ছবিতে কাজ করে বেশ লাগলো। আর আমি দেখলাম, রঞ্জনের কাজটা আমার ভাবনাকে আরও এনরিচ করছে, মানে সমৃদ্ধ করছে। আমি তো ফটোগ্রাফি থেকে ফিল্ম করতে এসেছি আর রঞ্জনের ভিস্যুয়াল সেন্সটা আমার স্ট্রেমে অনেক কিছু যোগ করেছে।

সুরজিৎ : তোমরা তিনজনে একটা টিম হলে। এই টিমটাই এগারো মাইলে ছিল।

রুচির : না, এগারো মাইলে তুমিও এলে। চারজনের একটা টিম হলো।

সুরজিৎ : ওই বোড়ালে মিমলু উৎসব করেছিল, তখন মহাদেব আবার তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। তুমি ভুলে গেছিলে কিন্তু আমার মনে ছিল।

রুচির : না, প্রথম আলাপটার কথা মনে ছিল না। তুমি মহাদেবকে চিনলে

কী করে?

সুরজিৎ : তোমাদের এই মিন্টো পার্কে অশোকা হল স্কুলের পাশের বিন্ডিং-এ ইনফোকম বলে একটা ভিডিও প্রোডাকশন হাউস ছিল। ওরা টিভিতে নানারকম সিরিয়াল করতো, সেই ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট টিভির যুগে, যখন শুধু ন্যাশনাল আর রিজিওনাল টিভি ছিল। বাংলা প্রোগ্রাম চলত ৬টা থেকে রাত ৮টা অবধি তারপর দিল্লি দূরদর্শন। ওই ইনফোকমের কিছু বাংলা প্রোগ্রামের স্লট ছিল। ওদের কিছু এপিসোডের স্ক্রিপ্ট করেছিলাম। মহাদেব ওখানে এডিট করতো। একবার একটা এপিসোড, মহাদেবের গ্রাম, হাওড়া - তারকেশ্বর লাইনে দিয়ারাতে শ্যুট হয়েছিল, সেই সময় শ্যুটিং-এ আমিও গেছিলাম। তখন ভালো করে আলাপ হলো।

রুচির : ওকে। ইট ওয়াজ নাইনটিন এইটটি এইট। মিমলু - পবন প্যারিস থেকে ফিরে এসেছে। দীপকদা চিত্রবাণী ছেড়ে দিয়েছেন, সাশা'র কাগজটা এডিট করেন। মিমলু বলল যে, ওরা বোড়ালে একটা উৎসব করবে।

সুরজিৎ : মিমলুর পারিবারিক সূত্রে পাওয়া অনেকটা জমি ওখানে আছে। ওরা থাকত ঝাউতলার বাড়িতে, মাঝে মাঝে ওখানে যেত।

রুচির : হ্যাঁ, তো আমি ভাবতাম এই উৎসবটা নিয়ে যদি তিরিশ মিনিটের একটা ডকুমেন্টারি করি, হাই ব্যান্ড ইউম্যাটিক ভিডিওতে, তাহলে কেমন হয়। কারণ ফিল্ম করতে পারব না ফিল্ম খুব এক্সপেনসিভ মিডিয়াম। তখন মিমলুকে বললাম যে, ওই উৎসবটা আমি শ্যুট করব। ওটা ফেব্রুয়ারির শুরুতে হয়েছিল। কিন্তু জানুয়ারিতে আমরা (আমি, মা, বাবা) বম্বে গিয়েছিলাম, একটা পারিবারিক বিয়ে অ্যাটেন্ড করতে। সেখানে আমার বাবার ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হয়। তারপর উনি সামলে নিলে, মা আর বাবা আমেদাবাদ চলে যান আর আমি কলকাতায় ফিরে আসি। ওই উৎসবটা শ্যুট করব বলে। আমার মন খুব

খারাপ, বিকজ অফ মাই ফাদার, কিন্তু বাউলের ব্যাপারটা আমাকে ভীষণ হন্ট করছিল।

সুরজিৎ : কিন্তু আমরা তো বোড়ালে গোবিন্দ নিহলনির অ্যাটন ক্যামেরায় ফিল্মে শ্যুট করেছিলাম, ভিডিওতে নয়। রঞ্জন ক্যামেরা করেছিল।

রুচির : বলছি সেটা। আমি কলকাতায় ফিরলাম জানুয়ারি এন্ড। তখন মঞ্জিরা দত্ত, ডাক নাম তৃপ্তি, সে একটা ডকুমেন্টারি ফিল্ম করছিল তার নাম 'ডেথ অব বাবুলাল ভুঁইয়া'। বাবুলাল একজন পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিস্ট ছিলেন বিহারে কোল মাইন এরিয়ায়, কোল মাফিয়ারা তাঁকে খুন করে। বেশ ভাল ছবি। রঞ্জন সে ছবির ক্যামেরা করবে, ওরা তখন বিহারে শ্যুটের প্ল্যান করছে। শুনলাম গোবিন্দ নিহলনির দামি অ্যাটন ক্যামেরা আসছে শ্যুটিঙের জন্য। ওরা যেদিন শ্যুট শেষ করে বসে যাবে, তারপরের দিন বোড়াল উৎসব শুরু। রঞ্জন বলল, এই ক্যামেরাটা আছে, ফিল্মে শ্যুট করলে ভালো হয়। সিক্সটিন মিলিমিটার ফিল্মে শ্যুট করলে আমারও ভালো লাগবে। কিন্তু অত টাকা ছিল না। মহাদেব বলল, আমার কাছে কিছু টাকা আছে। আমার কাছেও কিছু টাকা ছিল। এইসব মিলিয়ে মিশিয়ে সাত / আট রোল ফিল্ম কেনা হল। আর কোয়ার্টার ইঞ্চ টেপ কিনলাম মেট্রো গলি থেকে।

সুরজিৎ : আজও এই একই দোকান থেকে টেপ কিনি।

রুচির : আমিও দরকার পড়লে কিনি। তো রঞ্জন ফোনে নিহলনির সঙ্গে কথা বলে জানাল যে ক্যামেরার ভাড়া লাগবে না, কিন্তু যে দুদিন ক্লুরা হোটেলে থাকবে তার পয়সা দিতে হবে। আমি রাজি হয়ে গেলাম। কিন্তু শ্যুটের পর ফিল্মটা কোথায় এডিট করব, কত টাকা লাগবে, কোনও অঙ্ক নেই। শুধু একটা একসাইটমেন্টের ঝোঁকে, ওই যে নিক ম্যানিং বলেছিল, ঝাঁপিয়ে পড়। তাই ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

সুরজিৎ : বোধহয় ফেব্রুয়ারির ছয় তারিখ ছিল সেটা।

রুচির : হ্যাঁ। সেখানে তোমার সঙ্গে আবার আলাপ হয়। সুবলদা, হরি গৌসাই, মা গৌসাই এদের সঙ্গে আলাপ হয়।

সুরজিৎ : সেই সময় তোমার সঙ্গে গীতা (সেহগল)রও আলাপ হয়। আমার মনে আছে, সন্ধ্যাবেলা এই ঘরে বসে আমরা কাজ করছি বা মদ খাচ্ছি আর লাউঞ্জে একটা কালো ভারী টেলিফোন ছিল, সেটা ভীষণ জোরে বেজে উঠত রাত আটটা - সাড়ে আটটা নাগাদ। ওটা লন্ডন থেকে গীতার ফোন। তুমি কান খাড়া করে থাকতে কখন ফোনটা আসবে।

রুচির : গীতার সঙ্গে আলাপ ওই জানুয়ারিতে যখন বসে গিয়েছিলাম তখন। বসুধা আর গীতা বন্ধু ছিল, ওরা লন্ডনে এক অর্গানাইজেশনে কাজ করতো। কোম্পানির নাম বাগুং ফিল্মস। ডকুমেন্টারি ফিল্ম প্রোডিউস করতো। বিখ্যাত মার্কসিস্ট লেখক, অ্যাক্টিভিস্ট তারিক আলি আর ওয়েস্ট ইন্ডিজের মার্কসিস্ট এন্ড অ্যাক্টিভিস্ট ডার্কস হাউজ এরা ওই কোম্পানিটা চালাতো। গীতা আর বসুধা ওখানে রিসার্চের কাজ করতো। গীতা বসেতে বাগুং এর জন্য কয়েকটা ছোটো ছোটো ফিল্ম বানাতে এসেছিল। রঞ্জনের এক্স ওয়াইফ রুমি ওর বাড়িতে একটা পার্টি দিয়েছিল, সেখানে গীতাও ছিল। রুমি, রঞ্জন, বসুধা আর আমাকে ডেকেছিল। সেখানে গীতার সঙ্গে আমার আলাপ। আর আমাদের রিলেশনশিপটা স্টার্ট হয়।

সুরজিৎ : বোড়ালে উৎসবটা ভালই হয়েছিল। প্রচুর গান হয়েছিল আর একটা সুন্দর ভাব ছিল পুরো ব্যাপারটার মধ্যে।

রুচির : আমরা বোড়ালে সকাল থেকে মাঝরাত পর্যন্ত শ্যুট করলাম। পরের দিন সন্ধ্যাবেলা রবীন্দ্রসরোবরের মধ্যে।

সুরজিৎ : তখন ওটা ওপেন থিয়েটার ছিল। এখনতো ক্লোজড হল, নাম নজরুল মঞ্চ।

রুচির : ওখানে কনসার্টটা ভালো জমেনি। যদিও সুবলদার ওই *দিল দরিয়ার মাঝে দেখ / আছে মজার কারখানা* গানটা ব্রিলিয়ান্ট ছিল। ওটা আমরা ফিল্মে রেখেছিলাম। কিন্তু গৌর আসেনি, ওর পবনের সঙ্গী কী সব ঝগড়া হয়েছে। মনে ও তখন থেকেই এই ঝগড়ার ট্রিপটায় ঢুকে গেছে।

সুরজিৎ : আর পবন গেয়েছিল *চাই আনন্দ চাই প্রেম*।

রুচির : রঞ্জন খুব ভালো কাজ করেছিল হ্যান্ডহেল্ড ক্যামেরায়। আমি দেখলাম ট্রাইপড আছে, কিন্তু ব্যবহার করব না। বাউলদের এই আনপ্রেডিকটেবিলিটি আর নানা রকম ভাব ধরতে গেলে এটা হ্যান্ডহেল্ড ক্যামেরা করতে হবে আর এটার একটা ফ্রি মুভমেন্ট চাই। যেটা রঞ্জন খুব ভালো করেছিল থু আউট দ্য ফিল্ম। তো ক্যামেরা শেক ছিল, আন্ডার এক্সপোজ ছিল, আউট অব ফোকাস ছিল এসবই আমি ছবিতে ইনকরপোরেট করেছিলাম। বুঝেছিলাম বাউলদের নিয়ে একটা ছবি করতে গেলে এগুলো হবে। সেটাই ফিল্মটার ক্যারেকটার। এখন তো ওগুলো স্টাইল হয়েছে। তখন ফিল্মে এগুলো অ্যাডয়েড করা হতো। আর তাছাড়া আমি ঠিক করেছিলাম, একটা রিয়ালিস্টিক, এথনোগ্রাফিক, স্ট্রেট ডকুমেন্টারি ফিল্ম বানাতে চাই না। আমি কী বানাবো আমি জানি না, কিন্তু আমি জানি, আমার কিছু কিছু স্টাইলাইজড লাগবে, কিছু কিছু আনরিয়ালিস্টিক লাগবে আর কিছু কিছু রিয়ালিস্টিক লাগবে। বাউলদের নিয়ে কাজ করব, আমি দেওয়ালে একটা মাছির মতো, অদৃশ্য থাকবো আর বাউলরা ওদের এক্সোটিক জিনিসগুলো করে যাচ্ছে, আমি সেইগুলো ক্যাপচার করেছি, সে রকম ছবি আমার করার ইচ্ছেও ছিল না, সম্ভবও ছিল না। গৌর পবন, হরি গৌসাই দে আর ভেরি মাচ ক্যামেরা কনশাস। তো ক্যামেরা নিয়ে ঢুকলেই জিনিসটা অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে। এটা ভিডিও নয় যে, তুমি ক্যামেরাটা চালিয়ে ভুলে গেলে, তারপর দশ ঘণ্টার একটা ফুটেজ থেকে তুমি একটা পঞ্চাশ মিনিটের দারুণ ছবি বানালে। সেটা এখানে হওয়ার কথা নয়। দশ মিনিটের রোল আমাকে সব

সময় খেয়াল রাখতে হচ্ছে কখন ক্যামেরা অন করব আর কখন অফ করব। এখনকার এই ডিজিটাল জমানায় তো এটা কোনও সমস্যাই নয়।

সুরজিৎ : তারপর ওই শ্যুটিং রাশটা সল্ট লেকে প্রিন্ট করা হয়েছিল।

রুচির : রূপায়ণ। স্টেট গার্ডনমেন্টের। ওখানে চারজন তামিল কাজ করতো যারা নাকি ম্যাড্রাসের প্রসাদ ল্যাব থেকে এসেছিল। কিন্তু ওরা আমাদের ফিল্মটা প্রিন্ট করতে গিয়ে ড্যামেজ করেছিল। যেটা পরে অনেক টাকা খরচ করে ঠিক করতে হয়েছিল।

সুরজিৎ : পয়সা ছিল না বলে আমরা রাশটা ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইটে প্রিন্ট করেছিলাম, তাই প্রিন্টের গোলমাল বোঝা যায়নি।

রুচির : ইয়েস। ঐ এইটি এইটে জুনের লাস্ট উইকে বাবার সেকেন্ড অ্যাটাক হয়, জুলাই চার তারিখে উনি মারা যান। তার আগে ম্যাক্স মুলার ভবনের প্রোজেক্টরে একদিন বাবাকে ঐ বোড়াল আর রবীন্দ্রসরোবরের রাশগুলো দেখিয়ে ছিলাম। বাবার সিনেমা দেখার অভ্যাস ছিল, লেখক মানুষ, গুজরাতি ভাষায় ছোটো গল্প লিখতেন।

সুরজিৎ : তোমার বাবা, শিবকুমার জোশি, উনি তো সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছিলেন গুজরাতি ভাষায় গল্পকার হিসেবে।

রুচির : হ্যাঁ। বাবার বেশ কয়েকটা ছোটো গল্পের কালেকশন আছে। গুজরাতি সাহিত্যে ওনার লেখা লোকে পছন্দ করে। উনি দেখে বলেছিলেন, খুব ভালো জিনিস ধরেছ। এই ফিল্মটা কিছু একটা হবে। তো বাবা মারা গেলেন। আমি খুব আপসেট, ফ্রি লান্স করে চালাচ্ছি। এর মধ্যে আই টি সির সঙ্গে একটা যোগাযোগ হয়।

সুরজিৎ : গোল্ড ফ্লেক্স কিংস....

রুচির : হ্যাঁ, ওরা কিছু টাকা দিতে পারে। ওদের একটা ২০/২৫

মিনিটের ছবি করে দিতে হবে, গোল্ড ফ্লেক্স কিংস প্রজেন্টস...

সুরজিৎ : এই জন্য তোমাকে ৪/৫ টা মিটিং করতে হয়েছিল।

রুচির : গোল্ড ফ্লেক্স কিংসের ব্র্যান্ড ম্যানেজার মিঃ হাসান, তার কাছে ভালো জামা কাপড় পরে মিটিং করতে যেতাম।

সুরজিৎ : শুধু তাই নয়, প্রত্যেক বার যাবার আগে এক প্যাকেট গোল্ড ফ্লেক্স কিংস কিনে নিয়ে যেতে। একবার আমিও তোমার সঙ্গে গিয়েছিলাম।

রুচির : ওদের ওই বাজে সিগারেটটা ব্র্যান্ড ম্যানেজারের সামনে বসে খেতে হতো। ওরা চাইছিল বাউল – এথনিক মিউজিক – সেকুলার ইজম এটসেটরা নিয়ে একটা ছবি। এরপর জিজ্ঞেস করেছিল, বাউলরা কি ফিল্মে গোল্ড ফ্লেক্স কিংস খাবে। আমি বললাম, না, গোল্ড ফ্লেক্স কিংস খাবে না, কিন্তু দে স্মোক। ওরা রাজি হল, আমাদের পঁচিশ হাজার টাকা দিয়েছিল। আমি একটা কিছু কাজ করে খানিকটা টাকা পেয়েছিলাম। দুটো মিলিয়ে আবার গুটিং চালু।

সুরজিৎ : ওই টাকা পাবার পর আমরা পবনকে নিয়ে একটা রাত পার্ক স্ট্রিটে শুট করেছিলাম। *গোরা তুই আমারে পাগল করিলি রে* গানটা পবন গেয়েছিল।

রুচির : তখন এন এফ ডি সি-র অ্যারি এস আর ক্যামেরা নিয়ে শুট করা হল। তখন আমি ভাবছি যে ছবিটা নিয়ে এগোনো যাবে। এরা যে টাকাটা দিয়েছে সেটা দিয়ে একটা ট্রেলার করে অন্য কোথাও যদি ফান্ডের জন্য আপ্রোচ করা যায়।

সুরজিৎ : তারপর থেকে কিছুদিন আমাদের বেহালা আর সল্টলেক এর মাঝে দৌড়োদৌড়ি করতে হয়েছিল। তোমার ওই কালো মার্ক টু অ্যান্সাসাডারটা ছিল আমাদের প্রোডাকশন কার।

রুচির : WBJ 5874। আমার বাবার গাড়ি। আর আমি ড্রাইভার।

তোমরা কেউ গাড়ি চালাতে জান না। আমার ফিল্মের আমি ডিরেকটর আর শালা আমিই ড্রাইভার। তিন বছর ধরে এগারো মাইল তৈরি হয়েছে, বেশির ভাগ সময়টা আমাকে ড্রাইভারি করতে হয়েছে।

সুরজিৎ : আর তুমি ড্রাইভ করতে পছন্দ করতে না। খালি বলতে ট্যাক্সি নেব। আর মহাদেব বলতো, না, না শুধু শুধু পয়সা খরচ করার দরকার নেই।

রুচির : নট ওনলি দ্যাট, ও বলতো, এই রুচির তোর ট্যাক্সিটা নিয়ে চল না। আর কলকাতায় ড্রাইভ করা যে কী জিনিস। এনি ওয়ে বেহালায় এন এফ ডি সি-র স্টুডিওতে একটা স্টিনবেক এডিট মেশিন ছিল, সেখানে মহাদেব এডিট করতো আর সল্ট লেকে গুণ্টের রাশ প্রিন্ট করা হত।

সুরজিৎ : পার্ক স্ট্রিটে কোডাকের দোকান থেকে স্টকটা তুলতে হত।

রুচির : তার আগে ক্যামাক স্ট্রিটে শান্তিনিকেতন বিল্ডিং-এ এন এন এফ ডি সি-র অফিসে তেল মেরে ফিল্মের পারমিট তুলতে হত। ওরা এমন ভাব করতো যেন আমাকে পারমিট দিয়ে ধন্য করে দিচ্ছে অথচ কিনছি আমি।

সুরজিৎ : কোডাকের দোকানে চক্রবর্তীবাবু বলে কালো রোগা করে এক ভদ্রলোক ছিলেন, খুব নিচু গলায় আস্তে আস্তে কথা বলতেন, উনি আমাদের খুব ফেভার করতেন। যখনই আমি স্টক তুলতে গেছি বলতেন, আরও দুটো রোল আপনাদের জন্য রেখেছি, পারমিট করিয়ে আনুন।

রুচির : চক্রবর্তীবাবু আমাকে বলেছিলেন ওনার বাউল গান ভালো লাগে, আমি ওঁকে সেট করে রেখেছিলাম, যাতে স্টক এলেই আমরা প্রথম পাই। নইলে ওই সময় সিগ্গাটিন মিমিঃ ফিল্মের যা ডিমান্ড ছিল, মানে ওই ফিচার ফিল্মের জন্য। উনি আমাদের কয়েকটা ফ্রি টেস্ট প্রিন্টার রোলও দিয়েছিলেন। একটা হাই স্পিড ফিল্ম, একটা ইন্টারমিডিয়েট ডে লাইট ব্যালাসড ফিল্ম

আর একটা ফিফটি এ এস এ-র রোল।

সুরজিৎ : এরপর আমরা ডিসেম্বরে শান্তিনিকেতনে পৌষ মেলায় গেলাম।

রুচির : রঞ্জন তখন কলকাতায় ছিল না। মহাদেব সাউন্ড করবে, আমি একটা পুরোনো অ্যারিফ্লেক্স বি এল ক্যামেরা নিয়ে গেলাম। ইট ওয়াজ ডিভাসটার শুট। সান গান নিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু ক্যামেরাটা হ্যান্ডেল করাও আমার পক্ষে মুশকিল হচ্ছে। ওরকম একটা ভারী পাথরের মতো ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে হ্যান্ডহেল্ড করার কোনও চান্স নেই। ট্রাইপডে আমার মুভমেন্ট খারাপ। গৌর নেই, পবন আর সুবলদা আছে। দিনের বেলা কিছু হচ্ছে না, রাতে যেটা হচ্ছে সেটা খুব বোরিং। একটাই ভালো জিনিস ছিল, এগেইন সুবলদা *দিল দরিয়ার মাঝে* গাইলেন। যেটা আমরা ফিল্মে ব্যবহার করতে পারলাম।

সুরজিৎ : আমাদের সঙ্গে একটি পাকিস্তানি মেয়ে গিয়েছিল, সেহেবা, যে টেলিগ্রাফে কাজ করতো।

রুচির : ঠিক। জানুয়ারিতে আমরা জয়দেব যাই। শিবা চাচি দিল্লি থেকে এসেছিল তখন। ও আমাদের সঙ্গে জয়দেব গেল।

সুরজিৎ : দীপকার উৎসাহ ছিল ছবিটির জন্য।

রুচির : হুম ম... ছিল। দীপকদার তখন ফিল্মের সঙ্গে সম্পর্কটা এই যে, হ্যাঁ, তুমি কর, আমি বেশি কিছু বলতে চাই না। আর বাউলদের সঙ্গে ওনার নানা রকমের ডায়ানামিকস ছিল। উনি বুঝেছিলেন, আমি যদি খুব ক্লোজলি এই ছবিতে জড়িয়ে পড়ি তাহলে রুচিরের প্রবলেম হবে। তাই উনি একটু দূর থেকে ব্যাপারটা দেখতেন। জানুয়ারিতে কারোর একটা পুরোনো অ্যারি এস টি ক্যামেরা নিয়ে জয়দেব মেলায় যাই। সঙ্গে রঞ্জন আর মহাদেব। স্টুডিও পাড়ার গ্রিন রঙের ম্যাটাডোর নিয়ে আমরা রওনা দিলাম।

সুরজিৎ : সেখানে আমাদের আলাপ হয় কার্তিকের সঙ্গে। জয়দেব মেলা

নিয়ে খুব একসাইটেড ছিলাম আমরা।

রুচির : কিন্তু জয়দেব গিয়ে আরও প্রবলেম। ক্যামেরা ভেতর ফিল্মটা কী করে জানি পৌঁচিয়ে যাচ্ছিল, খুলে দেখা গেল ভেতরে কাঁচা ফিল্মের একটা ফুল হয়েছে। জুম লেন্সটা হারিয়ে গেছে, তারপর কার্তিক ওটা হারাধন বাউলের কাছ থেকে উদ্ধার করে আনে। মাথা খারাপ হয়ে যাবার মতো অবস্থা। ক্যামেরার ব্যাটারি ১চার্জ করতে পারছি না, পাওয়ার কর্ডটা পাওয়া যাচ্ছে না। অ্যাটেনডেন্ট সেটা আনতে ভুলে গেছে বা হারিয়ে ফেলেছে। টিপিক্যাল একটা বেঙ্গল প্রবলেম সিচুয়েশনের মধ্যে কোনও রকম শুট করছি। তার ওপর হেভি ব্রাউড, সাউন্ড রেকর্ড হচ্ছে ক্যাসেটে। তমালতলায় গৌর সুবলদাকে নিয়ে হাসাহাসি করছে। বলছে, উনি রসিক, উনি কিন্তু সালসাতে মালসা ভোগ খেয়ে থাকেন, বুঝেছি শিবা হা হা হা। এর মধ্যেই শুট চলছে। মনে হচ্ছে কিছুই পাচ্ছি না। তখন আবার মনে হলো এটা একটা সুন্দর, ভালো ফুটেজ তোলা ফিল্ম হবে না। ওই টেনশনের মধ্যে ক্রিয়েটিভলি শুট করার কোনো জায়গা নেই।

সুরজিৎ : পৌষ মেলা আর জয়দেব মেলা বাইশ দিনের তফাতে, দুটো শুটই খুব ফ্রাস্টেটিং হয়েছিল।

রুচির : জয়দেব থেকে ফেরার পথে কার্তিক একটা জায়গায় নেমে গেল। বলল, এই জায়গাটার নাম এগারো মাইল। আমি বললাম, এর মানে কী? বলল, জায়গার নামই এগারো মাইল। বুঝলাম, এটা অনেক পুরোনো নাম। তখনই মহাদেবকে বললাম, এই ছবিটার নাম ইলেভেন মাইলস।

সুরজিৎ : এই নামটা নিয়ে আমরা খুব এক্সসাইটেড হয়েছিলাম। শুনে মনে হয়েছিল, যে একটা এগিয়ে যাবার কথা এই শব্দটার মধ্যে লুকিয়ে আছে। আসলে আমরা বলেছিলাম ইলেভেন মাইলস। গ্রাফিক্যালি ইলেভেন নাম্বারটা দেখলে মনে হয় দুটো পা, একটা হাঁটার অ্যাসোসিয়েশন আসে।

রুচির : আর পাঁচটা আর ছয়টা রিপু মিলেও এগারো হয়, যাদের বিষয়ে বিভিন্ন বাউল গানে বার বার সাবধান করা হয়েছে। সুবলদার একটা গান আছে, চিরজীবন বাঁধা রইলি ছক্কা পাঞ্জার হাতেতে/ এসেছ বসেছ তবে তাস খেলিতে তো জয়দেব শুটিঙে আমি খুব ডিসঅ্যাপয়েন্টেড।

সুরজিৎ : পরে রাশটা দেখে বোঝা গেল, তমালতলার অংশটা খুব ভাল লেগেছিল।

রুচির : আর ওই কার্তিক মন্দিরের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, হাঁড়িগুলো রাখা আছে সেটাও খুব ভালো এসেছে ... রঞ্জন খুব ভালো শুটি করেছিল। জয়দেব মেলার পরে আমরা প্রেসিডেন্সি কলেজে বাউলদের গানের প্রোগ্রাম শুটি করলাম। এন এফ ডি সি অ্যারি এস আর ক্যামেরা দিয়ে।

সুরজিৎ : সনাতন দাস গেয়েছিলেন এখনো এলো না কালিয়া। পুরো গানটার অডিও ভিস্যুয়াল তোমার কাছে আছে, এটা একটা রেয়ার ফুটেজ।

রুচির : দেন উই ওয়েন্ট টু মাটিয়ারি। গৌরের বাড়ি। তুমি সেই ট্রিপটায় ছিলে না।

সুরজিৎ : আমার পারিবারিক সমস্যা ছিল সে সময় তাই যেতে পারিনি।

রুচির : সেবার আমি, রঞ্জন আর মহাদেব। সঙ্গে ক্যামেরা নিয়ে এন এফ ডি সি-র জয়ন্ত। খুব ভালো মেটিরিয়াল পেয়েছিলাম। গৌরের সেই একের পর এক গান, আবাদ হলো না দেহ জমি, মরণ কারো কথা শোনো না, ঢাকা শহর ঢাকা যতক্ষণ, হরি দুখ দাও যেজনা রে। গৌর ওয়াজ ম্যাগনিফিসিয়েন্ট। ওর বাড়িতে তখন ক্যাথরিন বলে একটি আমেরিকান মেয়ে, আনথ্রপলজিস্ট, থাকে। সে গৌরের ঘর ঝাঁট দিতো আর মুছতো রোজ। আর ছিল হরি আর ওর নয়টা বেড়াল। হরির মা মীরা মোহান্তির সঙ্গে আলাপ হলো। সেই শুটিঙাতে আই ওয়াজ ভেরি হ্যাপি। আগের শুটিঙুলোতে দেখেছি যে, রঞ্জন খুব চমৎকার জুম

লেন্সের ব্যবহার করেছে। এই শুটিঙায় আমি চেয়েছিলাম একটা অন্য লুক পেতে, অন্য একটা ফ্রেমে বিষয়টা দেখতে। তাই মহাদেবের সঙ্গে ডিসকাস করে জয়ন্তকে বললাম, রঞ্জন জুম লেন্স চাইলে বলবে আনতে ভুলে গেছি। আমরা শুধু ব্লক লেন্স দিয়ে শুটি করব। তো শেষ পর্যন্ত রঞ্জনকে বলা হল যে, জুম লেন্স আছে, কিন্তু ব্লক লেন্সেই শুটি করতে চাই। ও মাঝে মাঝে বলছে, এই রুচির, নাও আই নিড টেলি, আমি বলছি, নো ডু ইট উইথ ব্লক লেন্স। রঞ্জন ব্লক লেন্সে যে ভাবে গৌরের সঙ্গে ইন্টারাক্ট করে ছিল ইট ওয়াজ ব্রিলিয়ান্ট।

সুরজিৎ : গৌরকে লিটন হোটেলে শুটি করাটা ভুলব না।

রুচির : উফ্, কী ঝামেলা। যেদিন আমরা লিটন হোটেলে শুটি করছি পরের দিন ভোরের ফ্লাইট ধরে ও যাবে লস অ্যাঞ্জেলেস, ক্যাথরিন ওকে নিয়ে যাবে। আমাদের সঙ্গে দীপকদাও ছিলেন। সেদিন গৌরের সঙ্গে দীপকদার প্রচণ্ড ঝগড়া লেগে গেল। ও আশট্রে ছুঁড়ে মারবে দীপকদাকে। ক্যামেরা ভেঙে যাবে এই ভয়ে আমি ক্যামেরাটা ঘরের বাইরে রাখলাম, কিন্তু সাউন্ড অন ছিল, পুরো ঝগড়াটা রেকর্ড করা আছে।

সুরজিৎ : আচ্ছা, এবার চ্যানেল ফোরের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপারটা বল।

রুচির : ওই যে প্রথম শুটিঙা হয়েছিল বোড়ালে আর রবীন্দ্রসরোবরে, তার কয়েকদিন পর রঞ্জন বসে যায় ওর কাজে, আমাদের শুটিংর অডিওটা ও সঙ্গে নিয়ে যায় আনন্দ পটবর্ধনকে দেখাবে বলে। আনন্দের শুনে ভালো লেগেছিল। চ্যানেল ফোরের কমিশনিং এডিটর অ্যালেন ফাউন্টেনের সঙ্গে আনন্দের আলাপ ছিল। ও কথায় কথায় অ্যালেনকে বলে যে রুচির নামে একটি ছেলে বাউলদের নিয়ে একটা কাজ করছে, আমি সাউন্ডটা শুনছি। বেশ ভালো লেগেছে। তারপর বেশ খানিকটা শুটি হবার পর আমি আর মহাদেব ঠিক করি যে একটা ট্রেলার তৈরি করে লোকজনকে দেখাব ফান্ডের জন্য। পয়সা বেশি ছিল না বলে

৬টা পুরোটা কালারে করতে পারিনি, কিছুটা পোরশন কালারে ছিল বাকিটা ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট। তো একটা ১৪ মিনিটের ট্রেলার করে বসেতে টেলিসিনে করিয়ে ইউ ম্যাটিকে ট্রান্সফার করে সেটা নিয়ে আমি লন্ডন যাই। অ্যালেনের কমিশনিং তখন ছিল এক্সপেরিমেন্টাল ফিল্ম এন্ড ভিডিও। ট্রেলারটা দেখে ওর ভালো লেগেছিল। বিকজ ইট ওয়াজ নট স্ট্রেট ডকুমেন্টারি। অ্যালেন বলল, ও কে, আই ক্যান গিভ ইউ ফিনিশিং ফান্ড ফর ইট। এটা বেশ ভাল টাকা ছিল।

সুরজিৎ : এরপর আমরা নিশ্চিত্তে শ্যুটিং আর পোস্ট প্রোডাকশনের কাজ করেছিলাম।

রুচির : কোনও চাপ ছিল না, ফিল্ম রোল একটার বদলে দুটো কিনেছি, একটা স্টকে থাকবে। ক্যামেরা মরকার পড়লে একদিন বেশি রেখে দিয়েছি। তখন আমরা ফুল অন মুডে কাজ করেছি। কিন্তু গৌরের সঙ্গে কোনও কন্টাক্ট নেই। এরপর আমরা আড়ংঘাটায় সুবলদার বাড়িতে শ্যুট করেছি, ওই গানটা গেয়েছিলেন, ওই যেটাতে ছক্কা - পাঞ্জার কথা আছে।

সুরজিৎ : জ্ঞানানন্দের পদ, এসেছে বসেছ ভাবে তাস খেলিতে / এক ব্রহ্ম টেক্কার মর্ম জেনে নে মন আগেতে।

রুচির : হ্যাঁ, হ্যাঁ, তারপর নবাসনে হরিপদ গোসাই এর বাড়িতে ওনাকে আর মা গোসাইকে কে শ্যুট করা হলো

সুরজিৎ : হরিপদ গোসাই আবার পাংগলদের ওনার বাড়িতে রেখে চিকিৎসা করতেন। আমরা যখন গিয়েছিলাম তখন একটি ১৬/১৭ বছরের ছেলে ওনার কাছে ছিল, তার চিকিৎসা চলছিল। আমরা তাকেও শ্যুট করেছিলাম।

রুচির : হ্যাঁ, এছাড়া আমরা শ্যুট করলাম দীপকদার সেকেন্ড ইন্টারভিউ...

সুরজিৎ : গঙ্গায়, নৌকোর ওপর।

রুচির : দেন গৌরের বৌ হরিদাসি সুইসাইড করলো। খবর পেয়ে আমরা গেলাম। এইসব করে এতো মেটেরিয়াল নিয়ে আমরা তিন বছর ধরে ফিল্মটা করেছি। একটু করে শ্যুট করা হতো সেটা এডিট করে আবার একটু শ্যুট করা হতো। ওই যে সুবলদা আমার সম্পর্কে বলতো, রুচির রিসার্চ করসে। সবাই এই জোকটা নিয়ে হাসাহাসি করতো। একটা সময় ভাবতাম এটা কবে শেষ করবো? আমি কি এই সাবজেক্টটায় ট্র্যাপড হয়ে গেলাম? আসলে মাই ফিল্ম ওয়াজ আ ট্রিপ ইনটু দ্য বাউল ওয়ার্ল্ড। প্রায় ৫০ রোল ফিল্ম এক্সপোজ করেছি। আমার নিজেরই ভাবলে এখন অবাক লাগে।

সুরজিৎ : এডিট থেকে ফিরে তোমার বাড়িতে, তোমার সেই রেমিংটন টাইপ রাইটারে রোজ সন্ধ্যায় আমরা ইলেভেন মাইলসের স্ট্রাকচার লিখতাম আর পরের দিন এডিট বুমে ওটা ছিঁড়ে ফেলা হতো। মহদেব অসীম ধৈর্য নিয়ে রি-এডিট করতো, মাঝে মাঝে যে ধৈর্যচ্যুতি ঘটতো না তা নয়। তখন ওই বগড়া, খিস্তি এইসব খানিকক্ষণ করার পর এগেইন ব্যাক টু এডিট। আমি ছিলাম মহাদেবের অ্যাসিস্টেন্ট এডিটর। একটা বিরাট কালো ট্র্যাক্স ভর্তি রাশ, যেটা প্রথমে দশ/বারো রোল থেকে বেড়ে গিয়ে পঞ্চাশে দাঁড়ালো। তার মধ্যে ছোটো ছোটো কাট রোল, কোনটা ৩ মিনিটের তো কোনোটা ১০ মিনিটের। কোন সিকোয়েন্সটা কোথায় আছে, কোন রোলে কী আছে, সব আমাদের মনে রাখতে হতো।

রুচির : এর মাঝে এন এফ ডি সির স্টিনবেক মেশিন খারাপ হয়ে গেলো আমরা সল্ট লেকে রূপায়ণে ফাইনাল এডিট করলাম। সেই সময় ডায়ারির আইডিয়াটা, ভয়েস ওভারের আইডিয়াটা মাথায় ঢুকেছে। যেটা পুরো ফিল্মটাকে কানেস্ট করেছে একটা জালের মতো। আমার মনে আছে এই ঘরে ক্যামেরা ট্র্যাইপডে রেখে আমার ডায়ারি লেখা, কথা, শ্যুট করা হয়েছে। আমি, তুমি আর অমরেশ (চক্রবর্তী)। আমরা দু'দিন শ্যুট করেছিলাম। যেটা ফিল্মটাকে একটা অন্য লেভেলে নিয়ে গেছে।

- সুরজিৎ : এই সময় ক্যারোলিন স্পায়ার নামে এক মহিলা চ্যানেলে ফোর থেকে কলকাতায় এসেছিলেন। ছবিটা কদুর কী হলো সেটা দেখতে।
- রুচির : ডনি অ্যালেন ফাউন্টেনের সঙ্গে কাজ করতেন। অ্যালেন ওঁকে পাঠায়। ওনাকে তিন ঘণ্টার একটা রাফ কাট দেখানো হয়েছিল রূপায়ণে।
- সুরজিৎ : শেষে আমরা বস্বেতে গেলাম মিক্সিং করতে। ওখানে আমরা দু মাস ছিলাম, ভারসোভাতে রুমির ফ্ল্যাটে। তিনতলায় হেঁটে ওঠা। লিফট নেই। বিশেষত মধ্যরাতে ফিরে ওই তিনতলায় হেঁটে ওঠা একটা শাস্তি ছিল।
- রুচির : আর ওই মাছের গন্ধ, মাঝে মাঝে জল থাকে না, সামনের দোকানে কোলাপুরি চিকেন আর পমফ্রেট ভাজা পাওয়া যেতো। দুটোই হরিবল। মহাদেব ওই পমফ্রেট খুব খেতো।
- সুরজিৎ : আমরা এডিট করতাম বিধু বিনোদ চোপড়ার বউ রেণু সালুজার এডিটিং স্টুডিওতে। দিনের বেলা কেতন মেহতা ওর *মায়া মেমসাব* ফিল্মটা এডিট করতো আর রাতের শিফটগুলো আমরা পেতাম। কয়েক বছর পর শুনলাম রেণু ক্যান্সারে মারা গেছে।
- রুচির : রেণু খুব হেল্প করেছিল। রি-রেকর্ডিং হয়েছিল আরাধনা স্টুডিওতে, প্যাডি, পদ্মনাভন ছিল সাউন্ড রেকর্ডিস্ট, যে আবার ফেমাস পেন্টার কে জি সুব্রাহ্মনিয়ামের জামাই। ও খুব ভাল কাজ করেছিল। খুব মেটিকিউলাস ছিল।
- সুরজিৎ : বস্বের কাজ শেষ করে তুমি আর মহাদেব লন্ডন গেলে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি।
- রুচির : হ্যাঁ, গীতা আমার জন্য লন্ডনে অপেক্ষা করছে। যেদিন আমি যাব, তার আগেরদিন গীতার দিদিমা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ভারতে মারা গেলেন। গীতা এখানে এল আর আমি লন্ডনে

- গেলাম। লন্ডনে যাবার আগে নেগেটিভ কাটতে গিয়ে আডল্যাবের জলি বলল, মাটিয়ারির নেগেটিভে সাদা দাগ আছে। শুনে তো আমার মন খুব খারাপ। লন্ডন যাবার সময় ভেবেছিলাম কাজটা প্রায় শেষ, তখনও জানি না সাড়ে তিন মাসের খাটনি আরও বাকি আছে।
- সুরজিৎ : ফিল্মটা তো ১৫৫ মিনিটের দাঁড়ালো। থ্রি পার্টস।
- রুচির : হ্যাঁ। আমি লন্ডনের সোহোতে গেলাম, যেখানে ফিল্মের সব কাজ হয়। সেখানে দুটো অস্ট্রেলিয়ান মেয়ে যারা ফিল্ম নেগেটিভ ক্লিন করার এক্সপার্ট, তাদের কাছে গেলাম। মাটিয়ারির নেগেটিভ ক্লিন করাতে। ওরা একটা হিউজ ঢাকা চার্জ করেছিল। অনেকে বলে রুচির *ইলেভেন মাইলস* থেকে অনেক টাকা করেছে, ইটস নট টু। লন্ডনে অতদিন কাজ করতে হয়েছিল সেটা একটা বিরাট খরচা। ইন দ্য মিন টাইম গীতা ফিরে এসেছে।
- সুরজিৎ : আমরা শুটিঙে কোনও কম্প্রাইজড করিনি টাকার জন্য। কাজের সঙ্গে ফুর্তিফার্তাও হয়েছিল।
- রুচির : হ্যাঁ, ফুর্তিতো ভালই হয়েছিল। এনি ওয়ে, ওই মেয়ে দুটি ১২/১৪ দিন সাউন্ড ওয়েভ দিয়ে নেগেটিভটা ক্লিন করে। তারপর কোডাকের ল্যাবে কালার প্রিন্ট করা হয়েছে, সেটাও অনেক টাকা। এরপর ফাইনাল নেগেটিভ কাটও ওখানে করতে হয়েছে এবং সব পেমেন্ট পাউন্ডে হচ্ছে।
- সুরজিৎ : তোমাকে তো ফিল্মটা থ্রেড করতেও হয়েছিল।
- রুচির : সেটা আরেক ঝামেলা। বস্বেতে কম্পিউটারাইজড কালার থ্রেডিং এসে গেছে। কিন্তু লন্ডনে সেই পুরানো সিস্টেমে রেড গ্রিন ব্লু জেলাটিন দিয়ে থ্রেড করা হয়। রঞ্জন নেই, আমি দুজন বুড়ো সাদা কোটপরা ব্রিটিশ ল্যাব টেকনিশিয়ানের সঙ্গে বসে দশ দিন ধরে কাজটা করেছিলাম। রোজ সাত ঘণ্টা কাজ করতে হতো। মহাদেব ছিল একমাস। আবার একবার ফাইনাল মিক্স করে মহাদেব চলে আসে। একটা প্রিন্ট বার হয়, অ্যালেন সেটা

দেখে খুব খুশি।

সুরজিৎ : সিনেমা দ্য রিয়েল এ কী ভাবে গেল ইলেন্ডেন মাইলস ?

রুচির : এর মাঝে রঞ্জনের থুতে দিলীপ বর্মা আর ওর বউ ডোমিনিকের সঙ্গে আলাপ। দিলীপ কলকাতার ছেলে, রঞ্জনের ব্যাচমেট পুণে ফিল্ম ইন্সটিটিউটে, ফিল্ম মেকার, প্যারিসে থাকে। পরে কলকাতায় তোমার সঙ্গে ওদের আলাপ হয়েছে। দিলীপ বলল, ফিল্মটা নিয়ে প্যারিসে এসো। সিনেমা দ্য রিয়েল এর ডিরেক্টর তোমার ছবিটা দেখতে চায়, যদিও ওদের ফেস্টিভ্যালের জন্য ফিল্ম ক্রোজ হয়ে গেছে কিন্তু অ্যালেনের কাছে শুনেছে এই ছবিটার ব্যাপারে, ওরা দেখতে চায়। আমি ফিল্মের তিনটি রিল নিয়ে ট্রেনে চেপে প্যারিসে গেলাম।

সুরজিৎ : এবার ওই সিলেকশনের ব্যাপারটা বল।

রুচির : শট ফিল্ম হলে ওরা নিয়ে নিতো, কিন্তু ১৫৫ মিনিটের ছবি। ওরা না দেখে নেবে না। প্যারিসে ওই সময় শীতকাল, বৃষ্টি পড়ছে। আমি খুব নার্ভাস মানে ছবিটা নেবে কি নেবে না। তার ওপর ইংরেজি সাব টাইটেল করা নেই, মানে, সময়ই পাইনি। দিলীপ বলল, ভাবিস না, মদ খা, যা হবার হবে। আমি তোমাকে বলেছি দ্যাট ওয়াজ দ্য হ্যাপিয়েস্ট মোমেন্ট অফ মাই লাইফ টিল নাও। ফেস্টিভ্যাল ডিরেক্টর সুসেত গ্লেনাডেল, গস্তীর, বেঁটে, স্কোয়ার টাইপ, পাওয়ারফুল মহিলা, চেইন স্মোকার, আর ওর সহকারি মণিক, এই মেয়েটি অতো গস্তীর নয়, এরা দুজন ছবিটা দেখবে। শুধু প্রথম রিলটা দেখবে, মানে ৪০ মিনিট। প্রোজেকশনিস্ট ছবি চালালো, আমি মুখে মুখে ইংরেজিতে সুসেতকে বলছি আর দিলীপ মণিককে বলছে। প্রথম রিলটা শেষ হবার পর সুসেত মণিকের দিকে তাকালো, ওরা এক সঙ্গে বলে উঠলো, সেবো। এর মানে কী আমি জানি না, ফ্রেঞ্চ জানি না তো, আমি দিলীপকে বললাম, এ লোগ কেয়া কহে রহে? দিলীপ বললো, এ লোগ কহে রহে ফিল্ম আচ্ছা হয়। তারপরে

ওরা পরের রিলটা দেখতে চায়। কিন্তু প্রোজেকশনিস্ট বললো, আমাকে ৪০ মিনিট বলা হয়েছিল, আমার অন্য স্ক্রিনিং আছে, আমি চলে যাবো, তখন দিলীপ রিলটা চালালো। মণিক আর সুসেত আমার দু-পাশে, আমি ইংরেজিতে মুখে মুখে বলে যাচ্ছি। এই ভাবে ওরা পুরো ছবিটা দেখলো। বলল, হ্যাঁ, তোমার ফিল্মটা আমরা সিলেক্ট করলাম। কিন্তু সাব টাইটেল চাই। সময় বেশি নেই।

সুরজিৎ : কিন্তু গানগুলো সব আমরা অনুবাদ করেছিলাম।

রুচির : হ্যাঁ, সেগুলো আমার কাছে ছিলো। কথাও আমরা অনুবাদ করেছিলাম। কিন্তু কথা আরও ছোটো করতে হয়েছিল। আমি লন্ডনে ফিরে এসে সাব টাইটেল করতে শুরু করলাম। চারপাশে তখন বরফে সাদা হয়ে আছে। অর্না কুসটো বলে একটি মেয়ের সঙ্গে বসে, ওর বাড়িতে, ওর মেশিনে সাব টাইটেল লেখা হতো। ওই পুরোনো ডেস্ক টপ কম্পি ও দুটো সাব টাইটেল লিখছে, একটা ফিল্মের জন্য আর একটা টিভির জন্য। দ্যাট ফাকিং ফিল্ম টুক আ মাস্ট্র টু সাব টাইটেল। ওই মেয়েটি বেশ ভাল চার্জ করেছিল ফর দ্যাট জব। তখন একটা নেশার মতো কাজটা আমি করে গেছি। নো বডি উইথ মি, না মহাদেব না রঞ্জন। আমি ভাবছি এই ছবিটা কি আমি এই জীবনে শেষ করতে পারবো? আর সবাই যে যার কাজ করছে। রঞ্জন ওর কাজে ব্যস্ত, মহাদেব ওর কাজে ব্যস্ত, তুমিও অন্য কিছু একটা করছ। আমি একা ছবিটা নিয়ে মেতে আছি।

সুরজিৎ : ফেস্টিভ্যালটা বোধহয় মার্চে হয়েছিল। মহাদেবের কাছে সেরকমই শুনেছিলাম।

রুচির : ইয়েস, মার্চে আবার প্যারিস। সেই সময় বেশ ঠান্ডা ওখানে। এবার স্ক্রিনিং এর সময় ওরা লাইভ ফ্রেঞ্চ সাব টাইটেলের ব্যবস্থা করেছিল। তারপর তো অ্যাওয়ার্ড পেল।

সুরজিৎ : তখন তোমার মনে হলো যে, এতো খাটনি ঝামেলা

সার্থক হলো।

রুচির : তা মনে হলো, কিন্তু একটা কথা বলার আছে, এই রকম একটা ছবি করতে গেলে ইউ হ্যাভ টু ফাইট অন মেনি ডিফারেন্ট ফ্রন্টস। একটা হচ্ছে বাউলরা আমাকে সন্দেহ করছে, আরেকটা হচ্ছে টাকার ব্যাপার। আর টাকা থাকলেও এ দেশে ডকুমেন্টারি ফিল্মকে যে ভাবে দেখা হয়। যে এটা একটা ফালতু কাজ। স্পেশালি যদি পলিটিক্যাল ইস্যু নিয়ে ছবি না হয়। তুমি একটা ফিচার ফিল্ম করছো, নাসির আছে, শাবানা, স্মিতা এরা সব আছে, এর মানে আছে, যে আর্ট ফিল্ম করছে। কিন্তু বাউলদের নিয়ে এত বড়ো ছবি করছো, এর মানে কী?

সুরজিৎ : দীপকদা এটা কী ভাবে দেখতো?

রুচির : আমি একটা কথা মনে করি না, যে, কেউ মারা গেছে বলে তাকে ক্রিটিক করা যাবে না।

সুরজিৎ : সে তো বটেই। না করাটা এক ধরনের মিডিওক্রিটি।

রুচির : এটা আমি দীপকদার কাছেই শিখেছি। ওনার অনেক গুণ ছিলো কিন্তু অনেক প্রবলেমও ছিলো। দীপকদার নিজের জীবনেই একটা কনট্রাডিকশন আর হিপোক্রিসি ছিল। সেটা ওনার কাজের মধ্যেও ছিলো। এখন আমি বুঝি যারা কাজ করে তারা কেউ পারফেক্ট নয়। আমরা সবাই ওই হিপোক্রিসি আর কনট্রাডিকশন নিয়েই কাজ করি। ওই সুবলদার গানে যেমন বলেছে, *হয়জনাতে করল চুরি বাঁধলো আমারে/তারা চুরি করে খালাস পেল আমার দিলো জেলখানা/ জনমদুখি কপাল পোড়া গুরু আমি একজনা*। হয়জনকে নিয়েই আমাদের চলতে হয়। দীপকদা ভেবেছিলেন, আমি এই সাবজেক্টটা হ্যান্ডেল করতে পারবো না। শহর নিয়ে ছবি করলে ওর কোনো প্রবলেম হতো না। কিন্তু এই বাউল বিষয়টা তো ওর কোর এরিয়া। আর দীপকদাই আমাকে এই বাউলের নেশাটা ধরিয়েছে।

সুরজিৎ : মানে তুমি ওঁর জোনে ঢুকেছ বলে উনি ডিসকমফর্ট ফিল

করেছেন। আবার তোমাকে ভালোবাসতেনও।

রুচির : ওঁর প্রবলেম হচ্ছে এই ছবিটা গৌতম (চ্যাটার্জী) করছে না, এই ছবিটা ভাস্কর (ভট্টাচার্য) করছে না, এই ছবিটা বিবেক (বেনেগাল) করছে না, এই ছবিটা রুচির করছে। একদিকে উনি ভাবছেন, যে রুচির ফ্রেশ মাইন্ডে ব্যাপারটা দেখছে, রুচিরের ভেতর কিছু ব্ল্যাক ক্যানভাস আছে যেখানে আমি আমার মতো রঙ করে দিতে পারি।

সুরজিৎ : সেটা তো উনি করেও ছিলেন, আমি জানি।

রুচির : হ্যাঁ, আমি সেটা আকসেপ্ট করেছি। কিন্তু আবার উনি ভাবছেন, রুচির যদি ঝোলায়, যদি বাজে ফিল্ম করে, অর ইফ আই মেক এনি ফাক আপ উইথ দ্য বাউলস। হি ডাভল্ট ওয়ান্ট টু বি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য ফেলিওর।

সুরজিৎ : ছবিটা তো উনি তোমাকে করতে বলেননি।

রুচির : সেটাই তো কথা। ছবিটাতো আমিই করব বলে ঠিক করেছি। দীপকদা আমাকে দিল খুলে অনেক কিছু দিয়েছে, অনেক পরামর্শ, সাজেশন দিয়েছে, কিন্তু একটা জায়গায় টেনে রেখেছে। এমনকি দীপকদার প্রথম ইন্টারভিউটা যখন শ্যুট করি, হি ওয়াজ পারফর্মিং। গায়ে শাল দিয়ে আসনে বসে জ্ঞান দিচ্ছিল।

সুরজিৎ : ওই দু'হাত ওপরে তুলে বলছে, সুবল টেকস দ্য রিভার আপওয়ার্ডস।

রুচির : তারপর যখন হরিদাসি মারা যায়, রামানন্দ মারা যায়। দীপকদা নিজেও তখন ভেতরে ভেতরে দুর্বল হয়ে পড়েন। উনি নিজেও জানতেন ওনার হাতে বেশি সময় নেই। শরীরটা খারাপ হয়ে গেছে। সাইকোলোজিক্যাল ড্যামেজ অনেকটা নিয়েছেন। তাই সেকেন্ড ইন্টারভিউতেটাতে হি ইজ মাচ মোর ওপেন, ভালনারেবল। আর আমি পুশ করছি, হরির ব্যাপারটা বলো, রামানন্দের ব্যাপারটা বলো। উনি বলছেন। বলতে বলতে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

সুরজিৎ : গঙ্গায়, নৌকোর ওপরে।

রুচির : তখন বলছে, গৌর ইজ লাইক আ টাইগার। এই যে সব উনি বলছেন এটা আমার কোনো গ্রেট স্কিল নয় যে আমি ওকে দিয়ে বলিয়ে নিচ্ছি। ওনার নিজের চারপাশে দেওয়ালগুলো ভেঙে গেছে তখন। তাই ওঁর ভেতরে ঢুকতে পারছি আমরা।

সুরজিৎ : ১৯৯০ তে ইন্টারভিউ দিলেন আর ১৯৯৩ তে মারা গেলেন।

রুচির : আমরা কেউই ভাবিনি উনি এতো তাড়াতাড়ি চলে যাবেন। ফিল্মটা দেখে খুব খুশি হয়েছিলেন। তবে গৌর আর দীপকদার লিটন হোটেলের ঝগড়াটা ফিল্মে রেখেছিলাম। এটা আমার ক্রিটিক ওনার প্রতি, যে, বাউলরাও তোমাকে এরকম দেখে। ওই যে লিটন হোটেল গৌর দীপকদাকে বলছে, হে বন্ধু, তোমার বন্ধুত্বের ওপর আমি পেছাপ করে দিই। ওটা গৌর শুধু ওনার ওপর নয়, আমরা যারা ছিলাম, আমি, তুমি, রঞ্জন, মহাদেব সবার ওপর পেছাপ করছে। হঠাৎ আমরা সবাই ওর দুশমন হয়ে গেলাম। ছবির এই অংশটা নিয়ে দীপকদা কিছু বলেননি, বাট আই থিংক হি হ্যাড মিস্ট্রড ফিলিং অ্যাবাউট দ্যাট সিকোয়েন্স। ১৯৯১ এর এপ্রিলে কলকাতায় ম্যাক্স মুলার ভবনে ছবিটা দেখানো হয়েছিল। সে সময় হিজ ওন রিলেশনশিপ এন্ড ওন প্রজেক্ট উইথ বাউল ইজ ইন ট্রাবল। নিজে একরকম ভাবে একটা জিনিস চেষ্টা করেছেন। বাকিদের সাবধান করেছেন, তোমরা এদের এক্সপ্লয়েট করবে না, একজোটসাইজ করবে না, চিপলি দেখবে না, একটা ডিপার লেভেলে, ডিপার স্ট্রাকচারে যাওয়া তোমাদের দরকার। তুমি যদি ওদের কাছ থেকে কিছু চাও তাহলে তোমাকেও ওকে কিছু দিতে হবে। দীপকদা আবার একই সঙ্গে সেই লোক, যে ঋত্বিককে ডিফাইন করেছে। ঋত্বিকের ওই মদ খাওয়া, ব্যাড বিহেভিয়ার, কিন্তু ওই কষ্ট আর পেইন থেকে ঋত্বিকের যে কাজটা আমরা পেয়েছি, হোয়াট শুড আই সে, গ্রেট আর্ট। একটা ম্যাড্যারিক, বোহেমিয়ান, ভলতেরিয়ান, র‍্যাঁবোডিয়ান, ব্রেজিনেস অফ বেঙ্গলি সাইকি আছে। দীপকদা

সেটা পছন্দ করতেন।

সুরজিৎ : দীপকদার কাছে এটা ফ্যাক্টর ছিল না যে তুমি গুজরাতি কি জাঠ কি তামিল।

রুচির : ও দেখতো কেউ কিছু করছে তার মধ্যে ওই ম্যাডনেস আর কমিটমেন্ট আছে কিনা। তবে একটা কথা বলি, কলকাতায় একটা কথা চলতো সেই সময় যে, রুচির একটু গুজু ছেলে ও বাউলের কী বোঝে? কিন্তু আমি দীর্ঘদিন দীপকদার সঙ্গে কাটিয়েছি, বাউলদের বাড়ি গেছি, মেলায় গেছি, আই গট আ সেন্স অফ বেঙ্গল। আমি জন্মেছি লেক গার্ডেনে। আমি বেড়ে উঠেছি একটা বাঙালি কালচারের মধ্যে। পরিতোষ সেন আমার বাবার বন্ধু ছিলেন। আমার ব্যাপারটা হলো, সাম ডেজ আই এ্যাম বেঙ্গলি, সাম ডেজ আই অ্যাম নট বেঙ্গলি। আমার বাবা মা ভক্তি ট্র্যাডিশনের থেকে এসেছিলেন, ছোটবেলায় দেখতাম ওনারা ভোরবেলা ভজন গাইছেন। এই যে নন বেদিক ভক্তি ট্র্যাডিশন, এই যে গুরুর জন্য পাগল, যাকে গুজরাতিতে বলে গেলুপন। এটা তো জানতাম। মীরাবাইয়ের এটা ছিল। এই হলো ব্যাপার। এটা আমার মধ্যে আগে থেকে ছিল। তারপর যখন আমি এটা বেঙ্গলি ট্র্যাডিশন দেখলাম, ইট অ্যাওয়েকন্ড মি। অন দ্য আদার হ্যান্ড আই কানেক্ট টু দ্য বাউল বিকজ অফ জ্যাজ এন্ড ব্লুজ।

রুচির : এবার আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, ইলেভেন মাইলস যখন আমরা বানাচ্ছিলাম তখন তোমার কী মনে হচ্ছিল?

সুরজিৎ : ইলেভেন মাইলস আমার জীবনের প্রথম ডকুমেন্টারি ফিল্ম। এর আগে আমি অমিতাভর ফিচার ফিল্ম *কাল অডিরতিতে* কাজ করেছি। তো ডকুমেন্টারি ফিল্মে ওটা আমার প্রথম অভিজ্ঞতা আর বাউলদের সঙ্গেও আমার কাজ করার প্রথম অভিজ্ঞতা। দীপকদাকে আমি আগেই চিনতাম। কিন্তু শহুরে মানুষ হিসেবে বাউল বলতে পূর্ণদাস বাউলকে জানতাম আর ওরই গান শুনেছি, ওই বস্তাপচা *গোলেমালে পীরিত কোরো না*।

রুচির : হ্যাঁ, শান্তিনিকেতনে ওনার বাড়ির নেমপ্লেট দেখছিলাম 'বাউল সম্রাট পূর্ণদাস বাউল। রিডিকিউলাস'।

সুরজিৎ : আমার তখন পুরো জিনিসটা নিয়েই খুব উত্তেজনা। রোজ শু্যটে যাচ্ছি আর ভাবছি আজ কী হবে। আর এতো গান শুনছি, সেগুলো টেপ থেকে শুনে লিখছি। আমরা দুজনে বাংলা থেকে ইংরাজিতে অনুবাদ করছি, যার জন্য বারবার শুনতে হচ্ছে, শুধু গান মুখস্থ হয়ে গেল। দীপকদা এই সময় আমাকে একটা বই দিয়েছিলেন শশীভূষণ দাশগুপ্তের লেখা 'অবস্ফিওর রিলিজিয়াস কাল্টস'। তখন বেশ কঠিন লেগেছিল, আপ্রাণ চেষ্টা করে অর্ধেকটা পড়েছিলাম। দীপকদা বইটা নিয়ে নানা কথা বলেছিলেন। তাতে বাউল দর্শন, সহজ সাধনা, ব্যাপারটা কিছুটা বুঝেছিলাম। আরও পরে আবার ওই বইটা পুরোটা পড়ে অনেক জিনিস বুঝেছিলাম। দীপকদার কাছে আরও একটা বই ছিল উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের লেখা 'বাংলার বাউল ও বাউল গান'। সেটা একটা বারোশো পাতার বই। দীপকদা ওটা হাত ছাড়া করতেন না বলতেন, পড়তে হলে আমার বাড়িতে বসে পড়। সেটা পড়ার উপায় ছিল না। ওই বইটার কথাও উনি খুব বলতেন, কিন্তু তখন বইটা আউট অফ প্রিন্ট ছিল। সেটা অনেক বছর পর আবার ছাপা হলো, তখন পড়লাম। এই বইটা কিন্তু বাউল দর্শনের ওপর আকর গ্রন্থ।

রুচির : পরে তো তুমি বইও লিখেছ।

সুরজিৎ : সে তো ১৭ বছর পরে, সেটা ফকিরদের নিয়ে। তার আগে অমিতাভ ফকিরদের নিয়ে যে ডকুমেন্টারি ফিল্মটা করেছিল, সেই *বিশার ব্রুজ* এও আমি রিসার্চারের কাজ করেছি। তখন ফকিরদের সঙ্গে দেহতত্ত্বের আলোচনা করতে গিয়ে অনেক জিনিস বুঝতে পেরেছি। গৌর যে গেয়েছিল, *ঢাকা শহর ঢাকা যতক্ষণ*, এই ঢাকা শহরটা কোথায় তখন বুঝলাম, বা সুবলদার যে গান, *বৃন্দাবনের পথে যাব পথ দেখাবে কে*, এই বৃন্দাবন যে নিত্য বৃন্দাবন এবং তা আমাদের শরীরের ভেতরই আছে

এসব জানতে পারলাম। ইলেভেন মাইলসের অনেক গান আমার কাছে ছিল, সেগুলো নতুন করে শুনলাম। দেহতত্ত্বের গানের সঙ্গে বোঝাপড়াটা বাড়লো। *বিশার ব্রুজ* শেষ হবার পর আমার এঁদের বিষয়ে আরও জানতে ইচ্ছে করলো, তখন *ফকিরনামা* বইটার ভাবনা মাথায় এলো। এসব কিছু পিছনে ইলেভেন মাইলসের একটা বিরাট ভূমিকা ছিল। তবে আমরা ইলেভেন মাইলসে এই দেহতত্ত্বের বা সেক্সোয়োগিক প্র্যাকটিসের ব্যাপারটা ধরিনি।

রুচির : সেক্সোয়োগিক প্র্যাকটিসের ব্যাপারটা আমরা পুরোটা না বুঝলেও কিছুটা বুঝেছিলাম। ওটাতে বেশি ঢুকতে চাইনি, আমরা যেমন পুরোটা বুঝিনি, তেমন অডিয়েন্সকেও পুরোটা বোঝানোর কোনও দায় নেই। আমি যেটা বলতে চেয়েছি যে, এরকম একটা রিয়ালিটিতে তুমি ঢুকলে একজন শহরের লোক হিসেবে, তুমি কী ভাবে ইন্টার্যাক্ট করো, তোমার সঙ্গে কী ভাবে ইন্টার্যাকশনটা হয় বাউলদের বা এই রকম সাবঅলটার্ন পারফরম্যান্স ট্র্যাডিশনের সেটাই ছবিতে পোট্রে করা হয়েছে। দিস ফিল্ম ওয়াজ নট সাপোজড টু বি এ প্রাইমার অন দ্য বাউল। আমরা সেটা করতে চাইনি। তাহলে তো একজোটিক ইন্ডিয়া, সেক্স, বাউল নিয়ে একটা ছবি করতে পারতাম, বিক্রি করতে সুবিধে হত।

সুরজিৎ : একটি কথা মনে পড়ল বাউলদের প্রসঙ্গে তুমি অনেকবার বব ডিলানের কথা বলেছ। এটা কেন হল?

রুচির : বাউলরা আমেরিকায় গেলে বব ডিলান ওদের সঙ্গে ইন্টার্যাক্ট করেন। দেখ, বিটলসরা রবিশংকরের সাথে পরিচয় করে একরকম ভাবে এখনকার মিউজিকটা বুঝেছিল। বব ডিলান বিটলসদের জানেন। কিন্তু বাউলদের সঙ্গে মিশে উনি একটা অন্য উপলব্ধিতে পৌঁছেছিলেন। উনি আমাদের ভক্তি মুভমেন্ট, সুফি ট্র্যাডিশান, বুদ্ধিষ্ট প্র্যাকটিস আর তন্ত্র সবই নিজের মতো করে বুঝেছিলেন। বাউলদের বেসিক মেসেজটা বুঝেছিলেন, যে শরীরটাই হলো সাধনার একমাত্র মন্দির। ১৯৬৬ সালের জুলাই

মাসে ডিলানের একটা মোটরবাইক অ্যাকসিডেন্ট হয়। উনি এরপর নয় মাস পাবলিকের সামনে আসেননি। ১৯৬৭ সালে একটা অ্যালবাম করে উনি আবার লোকের সামনে আসেন। সেই অ্যালবামটার নাম *জন ওয়েসলি হার্ডিং*। সেই অ্যালবামটার কভারে দেখা যায় ডিলান কয়েকজন বাউলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন। গানগুলোতে কোনও বাউল ইনফ্লুয়েন্স নেই, সেগুলো ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি মিউজিক, কিন্তু বাউলরা কভারে আছে। ডিলানও একজন মিস্টিক সিঙ্গার, আমার মনে হয় উনি হয়তো বাউলদের ওনার ফেলো ট্রাভেলার মনে করে ওঁদের সঙ্গে কোথাও একটা একাত্ম বোধ করতেন, তাই কভারে ওই ছবিটা দিয়েছিলেন।

সুরজিৎ : বাউলরা ওয়েস্টার্ন সঙ্গে কী ভাবে মেলানো করছে এটা আমরা ইলেন্ডেন মাইলসে খানিকটা ধরেছিলাম।

রুচির : লেট সেভেন্টিজ বা আর্লি এইটিজের গৌর ফ্লেপা, সুবলদাস ঐরা দীপকদার সঙ্গে বিদেশে যাচ্ছে বা পবন মিমলুর সঙ্গে প্যারিসে যাচ্ছে, একটা অন্য ধরনের কেমিস্ট্রি হচ্ছে। আমরা এটাকে তিনটে সার্কেলে ধরতে চেয়েছি। ১) একটা হচ্ছে কোর ইনার সার্কেল। যেটা প্রোটেকটিভ। যেখানে বাউলরা থাকেন, গুরুর আশ্রম, মেলা ইত্যাদি। ২) সেকেন্ড সার্কেলটা হল, কলকাতা বা ছোটো মফস্বল শহর বা শান্তিনিকেতন যেখানে বাউলদের কোর ইনার সার্কেল থেকে বাইরে শহরের মানুষদের সঙ্গে মিশছে, বিদেশিদের সঙ্গে মিশছে। যেটা বাউলদের নিজেদের টেরিটরিও নয় আবার বিদেশও নয়। ৩) এই সার্কেলটা হল কলকাতার বাইরে বা বাংলার বাইরে। যেখানে লোকে বাংলায় কথা বলে না। যেটাকে আমি বলব আউটার সার্কেল, সেটা দিল্লি, বম্বে, বাঙ্গালোর বা চেন্নাই। এইটিকে এই সার্কেলটা হয়ে দাঁড়াল প্যারিস, নিউ ইয়র্ক, লস এঞ্জেলস, ইটালি, টোকিও, সুইজারল্যান্ড এক কথায় সারা পৃথিবী।

সুরজিৎ : আর বিদেশে বিভিন্ন মানুষ যেন বাউলদের নতুন করে

‘আবিষ্কার’ করল। মানে এমন হলো, একজন ফরাসি কলকাতায় এসে বলছে, কোথায় বাউলরা থাকে সেখানে যাব বা অমুক বাউল তো ওয়েল নোন, অন্য কারোর কাছে চল। একটা গানের জমায়েতে গেছি, কলকাতার লোক আছে কিছু বিদেশিও আছে। একজন তরুণ বাউলকে এমনও বলতে শুনেছি, সে আরেকজন বাউলকে জিজ্ঞেস করছে, কাকে ধরলে বিদেশ যাওয়া যাবে।

রুচির : এই জিনিসটাই কখনো ট্র্যাজিক, কখনো বিজার সিচুয়েশন তৈরি করেছে। একজন তরুণ বাউল ফ্রান্সে গিয়ে এক ফরাসি মেয়ের সঙ্গে মেলানো করেছে। ফরাসি মেয়েটির কাছে সেটা একটা সাময়িক ব্যাপার, কিন্তু বাউল ছেলেটি ভাবছে এই সম্পর্কটি সারা জীবনের। কিন্তু সেই মেয়েটি তা ভাবেনি। সে এই ব্যাপারটা নিয়ে আর ভাবেইনি। শেষ পর্যন্ত দেশে ফিরে ছেলেটি সুইসাইড করে।

সুরজিৎ : তুমি পবনের ভাই স্বপনের কথা বলছো তো?

রুচির : হ্যাঁ। এটা আমি দীপকদার কাছে শুনেছি, পবন যখন মিমলুর সঙ্গে প্রেম করছে, লক্ষণ দাস বিদেশে যাচ্ছে, নানারকম প্রেমালাপ চলছে বাউলদের ইউরোপিয়ান মেয়েদের সঙ্গে, স্বপন একটা ইয়াং ফ্রেঞ্চ মেয়ের প্রেমে পড়ে। মেয়েটাও বুঝতে পারেনি কী হচ্ছে। ওর স্বপনকে ভালো লেগেছে, কিন্তু ও বিয়ে করে সংসার করতে চায় না। স্বপন সেটা বুঝতে পারেনি। গৌতমদা আমাকে বলেছিল, হি গ্যুড হ্যাভ বিন প্রোটেক্টেড ফ্রম দ্যাট। ওই মেয়েটা অন্য সোশ্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছে, সেটা স্বপনকে কেউ বুঝিয়ে দেয়নি। ইটস নট ক্যাজুয়াল সেক্স এক্সজ্যাক্টলি, বাট ইট ডাজন্ট মিন শি ওয়ান্টস টু স্পেন্ড নাইন লাইভস উইথ হিম। তুমি ইউরোপ থেকে এই মদটা খেয়ে ফিরে, তারপর তুমি নিজেকে রিকনসাইল করতে পারছো না। মেয়েটা তোমার সঙ্গে কথা বলছে না। তুমি ভাবলে আর বেঁচে থেকে কী করবে? তুমি নিজের পেটটা কেটে দিলে।

সুরজিৎ : হারাকিরির মতো শোনায়।

রুচির : হ্যাঁ, কান্ডে দিয়ে পেটটা লেফট টু রাইট চিরে দিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়নি, অনেক কষ্ট পেয়ে এক সপ্তাহ হাসপাতালে থেকে মারা গেল। দ্য ওয়ার্ল্ড ফারিং ডেথ, হি ওয়াজ টোয়েন্টি / টোয়েন্টি থ্রি। উল্টোটাও হয়েছে, বিদেশিনী এসে বাউলের প্রেমে এমন জড়িয়ে পড়ল, উইদআউট আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইট, যে, শি কুডন্ট হ্যান্ডেল দ্য সিচুয়েশন।

সুরজিৎ : এই ব্যাপারটা হলো সেই দীপকদা যেটাকে বলতেন বাউলদের অ্যাটাক অ্যান্ড ইনভিটেশন।

রুচির : দীপকদা বলতেন, এভরি এমব্রেস ইজ আন অ্যাটাক অ্যান্ড ইনভিটেশন। তুমি যখন কাউকে জড়িয়ে ধরেছো, আলিঙ্গন করছো। তুমি তাকে বলছো, এসো। কিন্তু তুমি তাকে হামলাও করছো। আগেকার দিনে তুমি কাউকে বিশ্বাস করে জড়িয়ে ধরছো, তুমি জানো না, তার হাতে একটা ছুরি থাকলে তোমার পিঠে মেরে দিতে পারে। তো একটা ডাউটের ব্যাপার আছে। আর ছুরিটা রিয়েল না হয়ে ইট ক্যান বি আ মেটাফরিক ছুরি। তুমি ওই প্রেমালিঙ্গনের মধ্যে ঢুকে পড়লে, তখন ব্যাপারটা দাঁড়াল যে, ইটস অলসো অ্যান অ্যাটাক অন ইয়োর রিয়্যালিটি। যে তোমাকে আমাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে আর আমাকে তোমাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে। তো বাউলও আমাদের ওভাবে আলিঙ্গন করেছিলো। ট্রাস্ট করি কি করি না, জানি না, কিন্তু ওই সুবলদা বলতেন, রুচির রিসার্চ করসে। তো ওয়েস্টের সঙ্গে বাউলদের আলিঙ্গনটাও অ্যাট দ্য সেম টাইম ইটস অ্যান অ্যাটাক অ্যান্ড ইনভিটেশন।

সুরজিৎ : কিছু কিছু পজিটিভ জিনিসও হয়েছিল। দীপকদা গৌরকে নিয়ে পোল্যান্ডে গিয়েছিল জের্সি গ্রোটাভস্কির থিয়েটার ওয়ার্কশপে।

রুচির : ইয়েস, আই ক্যান ইমাজিন দোজ ম্যাজিক মোমেন্টস, যখন দীপকদা, গৌর আর গ্রোটাভস্কি নিজেদের মধ্যে ইন্টার্যাকশন

করছে। এমনকী নাসিরুদ্দিন শাহও ওদের সঙ্গে ছিল।

সুরজিৎ : দীপকদা পোল্যান্ডের একটা ঘটনার কথা বলেছিলেন যে, ওয়ার্কশপ চলাকালীন গৌর এক পোলিশ অভিনেতার সঙ্গে ঝগড়া করেছে আর সেটা হাতাহাতি পর্যন্ত গড়িয়েছে এবং পোলিশ ছেলেটির গায়ের জোর বেশি, সে গৌরকে একটা ঘুষি মারবে বলে রেডি এমন সময় গৌর খমকে টং করে আওয়াজ তুলে গান ধরে মরণ কারোর কথা শোনে না / ও সে যখন তখন যেথায় সেথায় দিতে পারে সদাই হানা, ছেলেটি থেমে যায়, গৌর পুরো গানটা গায়, ওয়ার্কশপের বাকি অভিনেতারা স্পেল বাউন্ড। গান শেষে গৌর ওই ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরে এবং দুজনেই কেঁদে ফেলে।

রুচির : দেখো, এগেইন সেই এমব্রেস। অ্যাটাক এন্ড ইনভিটেশন। এছাড়াও বাউলরা ওয়েস্ট গিয়ে মিউজিশিয়ান, সিন্ধার এদের সঙ্গে মেলামেশা করছে। ওরা দেখছে পৃথিবীতে ওদের মতো আরও খেপা আছে। সো দিজ বাউল-ওয়েস্ট ইন্টার্যাকশনস ওপেন আপ মেনি পাবলিসিটিজ। এটা নিয়ে কলকাতার অনেকের মনে হতো যে ওয়েস্ট বাউলকে ডিসটর্ট করছে। আমি তা মনে করি না। আর নইলে তোমাকে বাউলদের পাহারা দিয়ে রাখতে হয়। হুইচ ইজ রিডিকিউলাস। যে কোনও ট্র্যাডিশান তার বাইরের সমাজের সঙ্গে স্ট্রাগল করেই, সারভাইভ করে, বেঁচে থাকে। দেখো সুবলদা বা গৌরের মতো সিনিয়র বাউলরা এতোবার বিদেশে গেছে কিন্তু সেরকম টাকা করতে পারেনি, শারীরিক ভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে, সুবলদা তো মারাই গেলেন। অথচ ওঁদের রেঞ্জ গায়ক নয়, এমন অনেক ইয়ং বাউল অনেক ভালো আছে। তো একটা কয়েকশো বছর বা তারও বেশি পুরোনো ট্র্যাডিশনে এরকম আপস এন্ড ডাউন থাকেই।

সুরজিৎ : এই ধরনের ট্র্যাডিশন অনেকটা নদীর মতো আনপ্রিভিঙ্কেবল মুভমেন্টে চলে।

- রুচির : ইটস লাইক রিভার গোজ ওভারথ্রাউন্ড, রিভার গোজ আন্ডারথ্রাউন্ড, ইট ইমার্জস সাম হোয়ার কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট, ইন আ সারপ্রাইজিং প্লেস, হোয়ার ইউ ডোন্ট এক্সপেক্ট ইট।
- সুরজিৎ : সুবলদা গানে বলছেন, দেহের মধ্যে নদি আছে। ট্র্যাডিশনটা নদির মতো বইছে আর বাউল বলছে আমাদের শরীরের ভেতরও একটা নদি আছে।
- রুচির : সুবলদা এক আশ্চর্য মানুষ ছিলেন। এখন যত দিন যাচ্ছে আমি যখনই সুবলদার সঙ্গে মেলামেশার কথা ভাবি, আমি ততই ওটাকে ভ্যালু করি। দীপকদা সুবল সম্পর্কে বলতেন যে, ও একটা পুরোনো ইন্দো-বার্মিজ ট্র্যাডিশনকে মেন্টেইন করেছে। এটা নিয়ে আমরা তখন হাসাহাসি করতাম। কিন্তু এখন আমি বুঝতে পারি, সুবলদার কাছে কী ছিল, যা গৌর বা পবনের কাছে নেই। ও মানে সেই ইরাবতী থেকে গঙ্গা - ব্রহ্মপুত্রের এই পুরো এলাকার ট্র্যাডিশনটা, সাম হাউ সুবলদার কাছে ম্যাগনেট করে ওর ভিতরে ঢুকে ছিল।
- সুরজিৎ : সুবলদার গান করার যে ভঙ্গি, একতারাটা হাতে নিয়ে সোজা করে ধরে ডুগিটার ওপর চাপড় মেরে একপাক ঘুরে গিয়ে নাচের স্টেপটা যেভাবে ফেলতেন, সেটার কথা বলছো তো?
- রুচির : ইয়েস, দ্যাট বডি মুভমেন্ট ওয়াজ ব্রিলিয়ান্ট। ফিল্মে আমি ওই মুভমেন্টটা রেখেছি।
- সুরজিৎ : সুবলদার একটা রাধা ভাবও ছিল।
- রুচির : রাধা ভাব, আন্ড্রোজেনাস ভাব, অসাধারণ বডি ল্যান্ডুয়েজ। যেটা পবন মাঝে মাঝে ম্যানুয়াকচার করার চেষ্টা করে, আসলে কিন্তু ওর মধ্যে একটা ডিপ ম্যাচিসমো আছে। সুবলদার মধ্যে যেটা একদম ছিলো না। সুবলদা হয়তো কাউকে বলল, যে, না এটা করতে পারব না। সেটা কোনও মেল অ্যারোগেন্স থেকে বলছে না। বলছে একজন অর্থনায়ীশ্বর। মানে অথরিটি অফ দ্যাট কাইন্ড।

- সুরজিৎ : পবন, গৌর বা হরিপদ গৌসাই এঁদের একটা আলাদা মেল ব্যাপার আছে। যেটা সুবলদার একেবারেই ছিল না।
- রুচির : আর যে সুরটা ওর গলা থেকে বেরোতো, সেটা শোনা একটা অদ্ভুত এক্সপিরিয়েন্স, যাঁরা শুনেছেন তাঁরা জানেন, যখন গাইছেন, দেহের মধ্যে নদি আছে/সেই নদিতে বান ডেকেছে তখন একটা কম্যান্ড নিয়ে বলছেন আর যখন গাইছেন জনমদুখি কপাল পোড়া গুরু আমি একজনা তখন হি ইজ ব্রাইং।
- সুরজিৎ : গৌর হলো এর একদম বিপরীত। কিন্তু গৌরের ব্যাপারটা একটা ট্রাজেডি।
- রুচির : ওটা শুধু গৌরের জীবনের ট্রাজেডি নয়, আমাদের সবাইকার জীবনের ট্রাজেডি। গৌর কুড হ্যাভ বিন দ্য থ্রেটেন্স্ট। এখানে সবাই নুসরত ফতে আলি খানের কথা বলে, কিন্তু সাম হোয়ার ক্লোজ টু নুসরত, মানে গায়কির কথা বলছি না, একটা প্রেজেন্স, একটা স্পিরিচুয়ালিটির দিকে গানকে নিয়ে যাওয়া, এটা একমাত্র গৌর পারতো। ওর প্রবলেম হলো, ও কী সেটা ও দেখতে পেয়েছিল। পবন বা সুবলদা থ্রেটার পারসপেকটিভে নিজেদের পোটেনশিয়ালিটি অতো বুঝতে পারেনি। গৌর দেখে ফেলেছিলো ও কে।
- সুরজিৎ : কিন্তু ও যে স্টার, সেটা জানার পর ও স্টারডামকে হ্যান্ডেল করতে পারেনি।
- রুচির : ওর যে আরও ভাব ছিল, জেন্টেলনেস, লাক, হিউমার সেগুলো সব ও হারিয়ে ফেলেছে। এতো রাগ কেন? এতো অ্যাগ্রেসেনস কিসের? ইউ আর পসিবলি থ্রেটেন্স্ট, তুমি এগুলো ধরে রাখলে না কেন?
- সুরজিৎ : গৌর তোমার সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করেছে।
- গৌর : করেছে। ওর কাছে ওটা কোনও ব্যাপার না।

সুরজিৎ : তোমার সঙ্গে যখন প্রথম দুর্ব্যবহার করল তখন তোমার কী মনে হলো?

রুচির : মনে হয়েছিল ঠাসিয়ে একটা চড় মেরে বাড়ি থেকে বের করে দিই। পরমুহূর্তে ভাবতে লাগলাম কেন এই ট্র্যাজেডিটা হচ্ছে। বড় বড় রকস্টারের ডেথের কথা যখন ভাবি, জিম মরিসন, জিমি হেন্ড্রিক্স তারপর ওই মেয়েটি ... কী নাম যেন ...

সুরজিৎ : জেনিস জপলিন। যারা ড্রাগ ওভারডোজে মারা গেছে।

রুচির : ইয়েস এদের কথা যখন ভাবি, তখন আমার মনে হয়, যে গৌরকে আমি চিনতাম, সে ড্রাগ ওভারডোজে মারা গেছে। এখন যে গৌর চলে ফিরে বেড়ায় তাকে আমি চিনতে পারি না। যে গৌরকে আমরা ভালবাসতাম, যার ইমেজ পাবলিসিটি ছিল হি ইজ ডেড।

সুরজিৎ : গৌরের ইংরেজি বলা, সম্পূর্ণ ওর স্টাইলে ফিলসফিক্যাল জিনিসগুলো কনস্ট্রাক্ট করার ব্যাপারে, এসব ওর মধ্যে ছিল। গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা অর্গানিক ফুড, এসব নিয়ে গৌর কবে, সেই ১৯৮১ এ বলেছিল। বলছে, এই সূর্যটা বেশি গরম করে দিচ্ছে। হয়তো ক্যাথরিনের কাছ থেকে জেনেছিল। কিন্তু ও একটা জেন মাস্টারের মতো এই যে একা একা বলে যেতো, ডিলিরিয়াম বা প্রলাপের মতো, এটা আমি বেশ কয়েক বার শুনেছি, ব্রিলিয়ান্ট।

রুচির : গৌর বলছে, একটা বাচ্চা তুমি দশ মাস দশ দিন পেটে ধরে জন্ম দেবে আর একটা বাচ্চা তুমি কেমিকেলি জন্ম দেবে, কেমিকেলিটা ভাল হবে কি? ... এই কথা কোন বাউল বলবে? মানে হাফ শুনেছে ইংরেজিতে, হাফ শুনেছে ফরাসিতে, হাফ শুনেছে জার্মানে, ধরতে পেরেছে ও। টেকনিক্যালি হি ওয়াজ রিয়েলি ওড উইথ ফিক্সিং থিংস। হি হ্যাড আ গ্রেট মাইন্ড হুইচ হি ডেস্ট্রয়েড ইটসেলফ।

সুরজিৎ : যে মন থেকে ও গেয়েছিল, এই দেহ টর্চলাইটে গুরু গো ভরে দাও জ্ঞানের ব্যাটারি / আমি দিনের বেলা রাস্তা কানা আর রাতে হোঁচট খেয়ে মবি।

রুচির : সো গৌর ইজ ডিফিকাল্ট টু টেক। অনেক ভালোবাসা আছে, এখন যখন ওর দাঁত পড়ে গেছে, গলাটা আগের মতো নেই, ও বুঝতে পেরেছে এই বেশটা ফেলতে পারছে না। কিন্তু ফুললি খেলতেও পারছে না। এখন ও নখ দাঁত নেই এমন একটা পুরোনো বাঘ। কিন্তু সত্যি তো অনেক কিছু করে তুমি একটা পুরোনো বাঘ হতে পারতে। তা তো হলে না।

সুরজিৎ : যেটা সে পারেনি তা কী আমাদের সবাইয়ের দোষ? তাই বা বলি কী করে?

রুচির : কিন্তু একটা লেভেলে, তুমি বলো এই সোসাইটির স্ট্রাকচার আর একটা বাউলদের স্ট্রাকচারের মধ্যে একজন বাউল কী ভাবে সারভাইভ করবে? আমার কাছে কোনো উত্তর নেই।

সুরজিৎ : পবন কিন্তু যে ভাবেই হোক সময়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিলো।

রুচির : পবনকে যখন প্রথম দেখি কী সুন্দর গলা, কী মিষ্টি হাসি আর একটা বাচ্চা ছেলের মতো অভিমান রয়েছে।

সুরজিৎ : খুব বায়না করতো। এই দাও, ওখানে চলো, ওকে ডাকো। তবে মিমলু ওকে প্রোটেক্ট করেছে।

রুচির : এখন পবনকে দেখে আমার খুব ভালো লাগে। ওর একটা ম্যাচিওরিটি এসেছে, চুল পেকেছে, চশমা পরে, নাইস।

সুরজিৎ : আজ থেকে পঞ্চাশ কী একশো বছর পরে বাউল গান কী ভাবে সারভাইভ করবে বলো তোমার মনে হয়?

রুচির : জানি না। হতে পারে বাউল গান শুধু বেঁচে রইলো ফিল্মে, অডিও রেকর্ডিং এ সিডি, বা ভিসিডিতে। কিন্তু এই ট্র্যাডিশনটার

কিছু ম্যাজিক্যাল মোমেন্টস অন্য কোনও আর্ট ফর্মে ট্রান্সফর্মড হলো আর ওই ভাবেই বাউল সারভাইভ করবে। বাংলায় গ্রাম আর শহরের ডায়নামিক্সটা কোন দিকে যাবে তার ওপর অনেকটা নির্ভর করছে। এই বাউল ট্র্যাডিশন বাঁচিয়ে রাখার জন্য রাখার জন্য কোনও গার্ডমেন্ট সাপোর্ট নেই, প্রাইভেট সাপোর্ট নেই, কোনো এন জি ও নেই। আগেও ছিলো না, কিন্তু আগে গ্রাম ছিলো একটা শেল্টার, এখন সে শেল্টারটা নেই, কারণ গ্রামেরও একটা শিফটিং হচ্ছে।

সুরজিৎ : তুমি বেশ কয়েক বছর আগে সুইজারল্যান্ডে ছবিটা দেখালে লোকজন কী বলল?

রুচির : নিউ জেনারেশনের ভালো লেগেছে। ওরা দেখেছে ফিল্মের ডিভিডি কপি। যেটা ডিজিটাল ভিডিও নয়। যেটা স্মুথ নয়, জার্ক আছে, গ্রেইনস আছে, স্ক্যাচ আছে। তবু ওদের ভালো লেগেছে। আর যদি আমরা বাউল ট্র্যাডিশনের দিকে তাকাই তাহলে দেখব এই ট্র্যাডিশনটাও আমার এই ফিল্মের মতো। দীপকদা বলতেন, বাউলদের সঙ্গ করা মানে ক্যাকটাসের সঙ্গে ঘর করা। কাঁটায় একটু ছুঁড়ে যাবেই। পূর্ণদাস যেমন ক্যালিফোর্নিয়ায় বাউল আকাদেমি করেছে, সেখানে গেলে তোমার মনে হবে, বাউল ভীষণ নরম, মিষ্টি একটা জিনিস। বাউলরা মোটেও তা নয়। তারা অনেকেই বব মার্লের সমান, ইন টার্মস অফ ইনটেনসিটি অফ দেয়ার পারফরেন্স, অ্যান্ডার, প্যাশন এন্ড বিইং অ্যাবস্যালাউটলি কনফ্রন্টেশনাল হোয়েন দে নিউ টু বি। এরপর যখন ওরা প্রেম দেবে তখন তুমি আরেকটা রূপ দেখবে। সেটা আসে ওদের ওই রাধা হয়ে কৃষ্ণ প্রেমের জন্য।

সুরজিৎ : এখনো পর্যন্ত ইলেভেন মাইলস হলো বাউলদের ওপর তোলা লংগেস্ট ডকুমেন্টারি ফিল্ম।

রুচির : দ্যাটস্ টু। আমি এই বিষয়টাতে প্রোভোকড হয়েছিলাম কারণ সেরকম কোনও ফিল্ম বাউলদের ওপর ছিল না। লুনোর ছবিটা

আমার ভাল লাগেনি। খুব কনস্ট্রাকটেড লেগেছে। বাউলদের ওপর ফিল্ম হয়ে গেলে আমি আর এটা নিয়ে ছবি করবো কেন? আমি কি এখন ফরটিজ কি ফিফটিজের ইস্টবেঙ্গলের রিফিউজি দিয়ে ফিল্ম করবো? ওটা ঋত্বিক করে গেছেন।

সুরজিৎ : ফিল্মটা হয়ে যাবার পর তোমার বাউলদের সঙ্গে অন গোইং রিলেশনশিপটা রইলো না কেন?

রুচির : এটা নিয়ে আমার একটা রিপেণ্ট আছে। বিকজ অফ দ্য ওয়ে ইলেভেন মাইলস হ্যাপেন্ড, অনেক কষ্ট করে ছবিটা বানানো হয়েছে। আর ছবিটাতেও অনেক কষ্টের এভিডেন্স আছে। হরিদাসি যে ভাবে সুইসাইড করে। সেটা ক্যাথরিনের জন্য হয়েছে কি গৌরের নেচারের জন্য হয়েছে কি রুফাল রিয়ালিটির জন্য হয়েছে আমি বলতে পারবো না। পবনের ভাই স্বপন যে মারা গেলো ওর মেমোরিটা আমার কাছে খুব ক্লিয়ার ছিল। স্বপন মারা যায় ১৯৮৫ আর আমি ছবিটা শুরু করি ১৯৮৮। দীপকদা'জ ডিসইন্টিগ্রেটিং রিলেশনশিপ উইদ দ্য বাউলস। এই ছবিতে মহাদেব আর আমার মধ্যে বন্ধুত্ব খুব গভীর হয়, বাট অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ফিল্ম উই কান্ট টক টু ইচ আদার।

সুরজিৎ : তারপর ওই যে দিল্লির ছেলেটা, কী যেন নাম ... খালেদ, খালেদের ব্যাপারটাও খুব স্যাড।

রুচির : খালেদ তায়েবজি। থার্ড থিয়েটারের লোক। খুব ট্যালেন্টেড ছেলে। ও মাটিয়ারিতে গিয়ে গৌরের শিষ্য হয়। ও গৌরের কাছে নিজেকে সারেভার করে। বেশ কিছুদিন ভালো ছিলো কিন্তু গৌর ওকে মিস ট্রিট করে। মারধর করে। এই টর্চারটা থেকে খালেদ পালিয়ে গেলো। এর মধ্যে গৌরের গ্রামের লোকেরা গৌরের বাড়িতে হামলা করে, ভাঙচুর করে।

সুরজিৎ : হরি সুইসাইড করায় গ্রামের লোক গৌরের ওপর রেগে গিয়েছিলো। তাই ওরা হামলা করেছিলো, গৌরকে মেরেছিলো। এই কারণে গৌর আর মাটিয়ারিতে থাকতেই পারলো না।

রুচির : এই সব জিনিসগুলো আমাকে এফেক্ট করে। বাউলদের সঙ্গে আমার অন গোইং রিলেশনশিপটা কেন থাকেনি? একসেপ্ট কার্তিক, সুবলদা, পবন। বিকজ ইট ওয়াজ দ্যাট, যাদের জন্য ফিল্মটা করেছি, ওরা কী ভাবে জিনিসটা বুঝেছে, আমি কী ভাবে জিনিসটা বুঝেছি আই ওয়াজ জাস্ট রেপেন্ড আফটার, স্পেশালি বাই গৌর। আই শুড নট হ্যাভ লেট দ্যাট হ্যাপেন্ড। সম্পর্কটা আমি নানা কারণে রাখতে পারিনি। আমার মা মারা গেলেন, আমি থাকি দিল্লিতে, গীতা আর আমার ছেলেরা থাকে লন্ডনে। আমার একটা মনিটারি প্রবলেম এলো। দীপকদা মারা যান সেটাও একটা ড্যামেজ। সাম হাউ আমি চারপাশের রিয়ালিটিকে কাউন্টার করে বাউলদের সঙ্গে সম্পর্কটা রাখতে পারিনি। আই হ্যাভ মুভড অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য বাউলস।

সুরজিৎ : তোমার সঙ্গে কি ওই অ্যাটাক অ্যান্ড ইনভিটেসন হলো?

রুচির : ইয়েস, অ্যাটাক্ অ্যান্ড ইনভিটিশনের যদি বেশি হয় তাহলে তোমাকে ছেড়ে চলেও যেতে হতে পারে। আই রিপেট ফর দ্যাট। পার্থরা (মজুমদার) বাউল ফকিরদের যে ফেস্টিভ্যালটা অর্গানাইজ করে যাদবপুরে, সেখানে আমি দু'বছর গেছি, বেশিক্ষণ থাকতে পারিনি। কিন্তু পার্থরা এই ফেস্টিভ্যালটা অর্গানাইজ করে একটা ভালো জিনিস করছে, এর ফলে বাউল বা ফকিরদের সঙ্গে শহরের ডায়নামিজ্জটা কন্টিনিউ করছে। যেটা বলছিলাম, যে, এই সম্পর্কটা রইলো না এটা কে আমি আমার ফেলিওর বলে ভাবি না। এটা বাউলদের মধ্যেও থাকে, যে যখন মেলামেশা হবে হবে, তারপর আমি আমার দিকে, তুমি তোমার দিকে। তারপর আবার দেখা, আবার আদর, উই আর অল ইন অ্যান অরবিট। কিন্তু একটা মন খারাপ হয়, মাই লাইফ, মাই ফেট, মাই ওয়ার্ক ডিড নট ব্রিং মি ব্যাক টু দ্য বাউলস টিল নাও।

সুরজিৎ : ইলেভেন মাইলস থেকে তুমি কী মেসেজ পেলে?

রুচির : তুমি বলো তুমি কী মেসেজ পেলে?

সুরজিৎ : আমি ফকির আর বাউলদের কাছে যা পেয়েছি তা আমার বইয়ে লিখেছি। সেটা তুমি পড়তে পারবে না বাংলায় লেখা বলে, যদিও তুমি তাতে কিছু ডিজাইন করেছিলে। কিন্তু তুমি বলো।

রুচির : বেশ, তাহলে এটা আমাদের লাস্ট ডায়লগ, ওদিকে বিয়ারও শেষ হয়ে গেছে। এনে দেবারও কেউ নেই।

সুরজিৎ : দোকানে ফোন করলে বিয়ার দিয়ে যাবে না?

রুচির : ফোন! বস, এটা কলকাতা, এখানে সার্ভিস সেক্টরটা খুব খারাপ। এখন দোকানে ফোন করলে ১ ঘণ্টা বাদে পাঠাবে, তার মাঝে তোমাকে আরও ৪টে ফোন করতে হবে। অথচ দোকানটা এখন থেকে হেঁটে হেঁটে যেতে ৭/৮ মিনিট লাগে।

সুরজিৎ : বেশ এবার বলো মেসেজটা কী?

রুচির : দ্য বেসিক মেসেজ দ্যাট বাউলস গিভ ইউ, আসল মন্দির হলো তোমার শরীর। অ্যান্ড দ্য হিউম্যান সোল ইজ দ্য কন্ট্রোলার অফ দ্যাট টেম্পল। তোমার বাইরের দিকে তাকানোর দরকার নেই। ইউ আর দ্য পার্ট অফ দ্য ইউনিভার্স, বাট দ্য সেন্টার অফ দ্য ইউনিভার্স উইদিন ইউ। তো বাউলরা তাই একে অপরকে সেবা করে, ভালোবাসে, নিজের শরীরের যত্ন নেয়, অন্যের শরীরের যত্ন নেয়, কারণ দ্যাট ইজ অলসো সেন্টার অফ দ্য ইউনিভার্স। তাই নাচো, গান গাও, প্রেম করো, হাসো। স্মোক সাম গাঁজা ইফ ইউ ওয়ান্ট, ড্রিঙ্ক সাম আলকোহল ইফ ইউ ওয়ান্ট। কিন্তু গাঁজা বা মদ যেন তোমাকে খেয়ে না নেয়। ইউ কন্ট্রোল ইয়োর নেশা, অ্যান্ড দ্য টু নেশা ইজ দ্য ম্যাডনেস অফ ইউনিভার্স। আই মিন দিস ইজ নট আ সেইন থিং দ্যাট ইউ আর লুকিং অ্যাট।

সুরজিৎ : দিল দরিয়ার মাঝে দেখ আছে আজব কারখানা।

রুচির : ইয়েস, দ্য ট্রেজি ফ্যাক্টরি। ইউ আর ড্যান্সিং ইন দিস ট্রেজি ফ্যাক্টরি এন্ড দ্য ট্রেজি ফ্যাক্টরি ইজ ড্যান্সিং অ্যারাউন্ড ইউ।

দেহতরী দিলাম ছাড়ি ও গুরু তোমার নামে।
এবার আমি যদি ডুবে মরি গুরু
কলঙ্ক তোমার নামে।

With best compliments

Citius Travel Solution

AUTHORISED CHANNEL PARTNER

With best compliments

Anand Gupta BBSR

AUTHORISED CHANNEL PARTNER

With best compliments

Millenium Event

AUTHORISED CHANNEL PARTNER

With best compliments

Ramkrishna Bhandar

AUTHORISED CHANNEL PARTNER

With best compliments

Hi-Tech Luminaires

AUTHORISED CHANNEL PARTNER

With best compliments

Command Marketing

AUTHORISED CHANNEL PARTNER

With best compliments

3 Guys

AUTHORISED CHANNEL PARTNER

With best compliments

**Kakaranian
Industrial Stores**

AUTHORISED CHANNEL PARTNER

With best compliments

Tripura Electrical

AUTHORISED CHANNEL PARTNER

With best compliments

**Mohan
Impressions Pvt. Ltd.**

AUTHORISED CHANNEL PARTNER

With best compliments

**Supreme
Supplier Syndicate**

AUTHORISED CHANNEL PARTNER

With best compliments

Arindam Bhunia

AUTHORISED CHANNEL PARTNER

With best compliments

Roshni Enterprise

AUTHORISED CHANNEL PARTNER

With best compliments

P. P. Elektro Power

AUTHORISED CHANNEL PARTNER

With best compliments

K. K. Enterprise

AUTHORISED CHANNEL PARTNER

With best compliments
**Hi-Tech
Advertising Agency**
AUTHORISED CHANNEL PARTNER

With best compliments
Suman Traders
AUTHORISED CHANNEL PARTNER

With best compliments
**Saha
Electric Mart**
AUTHORISED CHANNEL PARTNER

With best compliments
A Well Wisher

With best compliments

Goutam Kr. Jana

AUTHORISED CHANNEL PARTNER

With best compliments

Millennium Event

AUTHORISED CHANNEL PARTNER